আনা ফ্র্যাঙ্ক
গল্প উপন্যাস স্মৃতিকথা

ভাষান্তর : অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

দীপায়ন
২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
৭০০০০৯ কলিকাতা



দীপায়ন প্রকাশিত অন্যান্য বই

ফ্রেড উইলমান

রিইউনিয়াম

স্টিভ্ নেলসন

ভলানটিয়ার্স

এরস্কিন কল্ডওয়েল

ট্রাবল ইন জুলাই

ম্যাকসিম্ গর্কি

মা

ভেরকরস

সাইলেন্স অব দি সী

জিওফ্রে ট্রিজ

বোজ এগেন্সট দি ব্যারনস

রমেশচন্দ্র দত্ত

পিজ্যান্ট্রি অব বেঙ্গল

গোলাম কুদ্দুস

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে (বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ)

মার্ক টোয়েন

টমসয়্যার এ্যাব্রড

পল লাফর্গ

সম্পত্তির বিবর্ত্তন

নির্মাল্য নাগ

শিল্পচেতনা

লুইস হেনরী মর্গান

এনসিয়েন্ট সোসাইটি

চার্লস ডারউইন

ডিসেন্ট অফ ম্যান

ক্যাডির জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

চোখ মেলে ক্যাডি প্রথমে দেখলো—তার চারপাশে সবকিছু সাদা, সবকিছু ধোঁয়া ধোঁয়া। শুধু ওর মনে পড়ল, জ্ঞান হারানোর আগে কে যেন ওকে ডেকেছিল···একটা মোটর, ও পড়ে গেলো···আহ, তারপর···তারপর সব কিছু আঁধার হয়ে এলো। এখনও ওর ডান পায়ে আর বাঁ হাতে সূঁচ ফোটার মতো তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। সামান্য কাতরানির শব্দ ফুটছে ওর গলায়, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না ও। আর তখনই সাদা মস্তক-আবরণে ঢাকা একটা কোমল মুখ ঝুঁকে পড়লো ওর ওপর।

'খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? কী হয়েছিল, তোমার কিছু মনে পড়ছে?' সিস্টার শুধোলেন।

'আমার···না, কিছুই তো হয়নি!'

ক্যাডির কথা শুনে সিস্টারের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

তারপর ক্যাডি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রাস্তায়···একটা মোটর, আমি পড়ে গেলুম···আমার আর কিছু মনে নেই।'

'আচ্ছা বেশ, এবার তোমার নামটা বলো দেখি। তোমার মা-বাবাকে তো একটা খবর দেওয়া দরকার, তাঁরা তোমাকে দেখতে আসবেন। এতক্ষণ নিশ্চয়ই তাঁরা খুব চিন্তা করছেন।'

ভয়ে আঁতকে উঠল ক্যাডি, 'কিন্তু···কিন্তু, মানে', এছাড়া কিছু বলতেই পারল না ও।

'না না, ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই। খুব বেশিক্ষণ তুমি মা-বাবার

কাছ ছাড়া হও নি। এখানে তো তুমি মাত্র ঘণ্টাখানেক হল এসেছো।'

অতি কষ্টে মুখে এক টুকরো হাসি ফোটালো ক্যাডি, 'আমার নাম ক্যারোলিন ডরোথি ফান আলটেন্হফেন, ডাক নাম ক্যাডি। বাড়ির ঠিকানা—২৬১ নম্বর স্ুডার আমস্টেল্যান।'

'মা-বাবার জন্যে খুব মন কেমন করছে বুঝি?'

আস্তে করে ঘাড় নাড়লো ক্যাডি। আহ,বড় ক্লান্ত লাগছে ওর, আর খুব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে, ঘুমিয়ে পড়লো ও।

সাদা ধবধবে একটা ছোট ঘরে, ক্যাডির বিছানার কাছেই বসে আছেন সিস্টার অ্যাঙ্ক। ফ্যাকাশে মুখটার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি। বালিশের ওপর এলিয়ে রয়েছে মেয়েটা, শান্ত মুখখানা, যেন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু একটা কিছু ঘটেছে তো বটেই। রাস্তা পেরোচ্ছিল ক্যাডি, আর ঠিক তখনি মোড় ঘুরছিলো গাড়িটা। গাড়িটার ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল ও। ডাক্তারবাবু বলেছেন—ওর পায়ের দুখানা হাড় ভেঙেছে, কালশিরা পড়েছে বাঁ হাতটাতে, আর বাঁ পায়ের পাতাতেও বেশ চোট লেগেছে।

দরজায় একটা মৃদু ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকলেন মাঝারি উচ্চতার এক ভদ্রমহিলা আর তাঁর পিছু পিছু বেশ লম্বা, সুদর্শন একজন ভদ্রলোক। সিস্টার অ্যাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ক্যাডির বাবা-মা। মিসেস ভান আলটেন্হফেনের মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ভীত-সন্ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ক্যাডি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিছুই দেখতে পেল না ও।

'বলুন সিস্টার, বলুন—কী হয়েছে ওর? কতক্ষণ যে ওর কোন খোঁজ পাইনি! কিন্তু ওর কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে একথা ভাবতেও ···না···না···'

'চিন্তার কিছু নেই ম্যাডাম। আপনার মেয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে।'

দুর্ঘটনাটার বিষয়ে যে-টুকু শুনেছেন, সে-টুকু ক্যাডির মা-বাবাকে জানালেন সিস্টার অ্যান্ড। ঘটনাটা যতটা সাভ্বাভিক, তার থেকে অনেক সহজভাবেই বলে গেলেন, যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়। বলতে বলতে তাঁর নিজের মনটাও বেশ হাল্কা হয়ে উঠল। কে জানে, মেয়েটা হয়ত শিগগিরই ভালো হয়ে উঠবে!

এইসব কথাবার্তার ফাঁকে ঘুমটা ভেঙে গেল ক্যাডির। চোখ মেলে ও দেখলো—মা-বাবা সামনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ যেন নিজেকে বড় অসুস্থ মনে হল ওর। যখন শুধু সিস্টার ছিলেন ঘরে, তখন নিজেকে ঠিক এতটা অসুস্থ মনে হয়নি ওর। একরাশ চিন্তা যেন আছড়ে পড়লো ক্যাডির মাথায়, চোখের সামনে ফুটে উঠল কত শত ভয়ঙ্কর ছবি। ও ভাবছিল—সারা জীবনের মতো হয়ত পঙ্গু হয়ে যাবো আমি, একটা হাত হয়ত কেটে বাদ দিতে হবে, আরো মারাত্মক কিছুও ঘটে যেতে পারে!

ক্যাডির মা দেখলেন—মেয়ে জেগে উঠেছে। বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধোলেন তিনি, 'খুব কী কষ্ট হচ্ছে, মা? এখন কেমন লাগছে? আমি কি তোর সঙ্গে থাকবো? কি, ভাল লাগছে?'

সবকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা কি আর ক্যাডির আছে! ও শুধু আস্তে করে ঘাড়টা নাড়লো, আর ভাবলো—আহ্, এ-সব হৈ-চৈ থামলে বাঁচি! তারপর, একটাই শব্দ ফুটলো ওর ঠোঁটে, 'বাবা!'

লোহার তৈরী লম্বা বিছানাটার একধারে বসে বসে, মেয়ের অক্ষত হাতটা চেপে ধরলেন মিস্টার ফান আলটেন্‌হফেন। কথা বলার শক্তি বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

'তুমি খুব ভালো বাবা, খুব ভালো…' এইটুকু বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো ক্যাডি।

দুর্ঘটনার পর পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। ক্যাডির মা রোজই সকালে-বিকালে আসেন, কিন্তু তাঁকে খুব বেশিক্ষণ থাকতে দেওয়া হয় না। সারাক্ষণ ভয়-মাখা কথা বলে বলে মেয়েটাকে একেবারে ক্লান্ত করে দেন ভদ্রমহিলা। আর ক্যাডি যে মায়ের থেকে বাবাকেই বেশি করে চায়, সেটাও নজর এড়ায়নি সিস্টারের।

ছোট রোগীনিটিকে নিয়ে কোন ঝামেলাই পোয়াতে হয় না সিস্টারকে। মাঝে-মাঝে ক্যাডির খুবই যন্ত্রণা হয়, ডাক্তার ওর ভাঙা পা বেঁধে দেওয়ার পর তো আরও বেশি করেই হয়, কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটিও করে না ও, আর কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না।

সিস্টার অ্যাঙ্ক যখন একটা বই কিম্বা সেলাই-টেলাই নিয়ে ওর বিছানার পাশে এসে বসেন, তখন নানান কল্পনার এক আশ্চর্য জগতের গভীরে ডুবে যেতে বড় ভালো লাগে ওর। প্রথম কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর থেকে ক্যাডি আর সারাক্ষণ ঘুমোয় না, বরং দু'চারটে কথা বলতে চায়। অন্যদের থেকে অবশ্য সিস্টার অ্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলে বেশী আনন্দ পায় ও। সিস্টার অ্যাঙ্ক খুব শান্ত স্বভাবের মহিলা, কথা বলেন নরম গলায়। তাঁর এই কোমলতাটুকু ক্যাডির অন্তরকে স্পর্শ করে। ওর এখন মনে হয়—ওর জীবনে সে মায়ের উষ্ণ ভালবাসা ও মমতা কখনো পায় নি? আস্তে আস্তে দুজনেই দুজনকে বিশ্বাস করতে শুরু করল।

দিন পনেরো কেটে গেছে। সিস্টারের কাছে নিজের অনেক কথাই বলেছে ক্যাডি। একদিন সকালবেলা সিস্টার অ্যাঙ্ক ক্যাডির কাছে ওর মায়ের কথা জানতে চাইলেন। বেশ কায়দা করেই কথাটা পাড়লেন সিস্টার। ক্যাডি জানতো—এই প্রশ্নটা একদিন উঠবেই। খুশি হয়ে উঠল ও। যাক, তবু একজনের কাছে সব কথা বলে মনটা

হাল্কা করা যাবে।

ও বলল, 'কেন, মায়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি কি মা-র সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি?'

'না-না, তা কেন। তবে আমার মনে হয় বাবাকে তুমি যতটা ভালোবাসো, মাকে ঠিক ততটা বাসো না। একটু যেন আড়ো-আড়ো ভাব করো।'

'হুঁ, ঠিকই ধরেছেন। মায়ের জন্যে আমার যেন তেমন অন্তরের টান নেই। এর জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়। আসলে মা আমার থেকে একেবারেই আলাদা। এমনিতে হয়ত ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, কিন্তু আমি যা করতে চাই, যা যা ভালোবাসি, সে-সব জিনিসকে মা মোটে বুঝতেই চান না। আচ্ছা সিস্টার অ্যাঙ্ক, বলতে পারেন, কী করলে মা বুঝতে পারবেন যে আমি তাঁকেও বাবার মতোই ভালোবাসি? আমি জানি মা আমাকে খুব ভালোবাসেন। হাজার হোক, আমিই তো মা-বাবার একমাত্র সন্তান'।

'আমার মনে হয় মা তোমার ভালোই চান, কিন্তু সঠিক উপায়টা খুঁজে পান না। আচ্ছা, উনি কি একটু লাজুক প্রকৃতির?'

ক্যাডি বলল, 'না-না, লাজুক মোটেই নন। উনি মনে করেন মা হিসেবে ওনার কাজকর্মে কোন গলদ নেই। যদি কারো মুখে শোনেন আমার ব্যাপারে ওনার ব্যবহারে কিছু ভুল হচ্ছে, তাহলে একেবারে হাঁ হয়ে যাবেন। মা-র ধারণা হল যে সবসময় ভুলটা শুধু আমারই। সত্যি বলছি সিস্টার, আপনার মতোন মা পেলে আমি বর্তে যেতুম। সত্যিকারের মা বলতে যা বোঝায়, তা আমি পাইনি। আমার মা কোনদিনই আমার সত্যিকারের মা হয়ে উঠতে পারবেন না, এ আমি ঠিক জানি। কিন্তু মানুষ যা চায়, তা কি তার নিজের মতো করে পায়? সবাই ভাবে আমি খুব সুখী, আমার নাকি সব আছে। সুন্দর একটা বাড়ি আছে, মা-বাবার মধ্যেকার সম্পর্কও খুব ভালো, যা চাই তা-ই পাই। কিন্তু বলুন তো সিস্টার, একটা মেয়ের জীবনে সত্যিকারের

দরদী মায়ের দরকারটা কি খুব প্রয়োজনীয় নয়? ছেলেদের জীবনেও কি তা দরকার হয়? ছেলেদের ভাবনা-চিন্তা সম্বন্ধে আমি কতটুকুই বা জানি? কখনো তো কোন ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিনি। ওদের জীবনেও নিশ্চয়ই দরদী মায়ের দরকার হয়। তবে হয়ত অন্যভাবে, ঠিক মেয়েদের মতো করে নয়। মায়ের আসল গলদটা কোথায়, আমি জানি। অন্যের মন বুঝে চলার ক্ষমতা ওঁর নেই। সবথেকে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো নিয়েও উনি একেবারে সাদামাটাভাবে কথা বলেন।

আমার মনের মধ্যে কী ঘটে চলছে না চলছে, মা তার কিছুই বুঝতে পারেন না। এদিকে বলেন যে ছোটদের নিয়ে থাকতে নাকি ওঁর খুবই ভালো লাগে। ধৈর্য কাকে বলে, কোমলতা কাকে বলে, মা জানেনই না। উনি একজন নারী ঠিকই, কিন্তু সত্যিকারের মরমী মা হবার ক্ষমতা ওঁর নেই।'

সিস্টার অ্যাক্ষ একটু বোঝাতে চেষ্টা করলেন ক্যাডিকে, 'ছাখো ক্যাডি, মায়ের সম্বন্ধে এরকম ভাবতে নেই। উনি হয়তো তোমার থেকে আলাদা ধরণের। তবে কি জানো, ওনার জীবনে হয়তো এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্যে উনি আর কোন জটিলতার মধ্যে এখন যেতে চান না। এমনটাও তো হতে পারে।'

ক্যাডি বলল, 'তা তো আমি জানি না সিস্টার। আমার বয়সী মেয়েরা মা-বাবার জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু জানে বলুন? মা তো আমাকে এ ব্যাপারে কখনো কিছু বলেন নি। তবে এটা সত্যি, আমিও মা-কে বুঝি না, মা-ও আমাকে বোঝেন না। তাই আমরা কেউ কাউকে আন্তরিক ভাবে বিশ্বাসও করতে পারি না।'

'আর তোমার বাবা?'

'বাবা জানেন, আমার আর মায়ের মধ্যে মিল নেই। মা-কে আমি যতটুকু বুঝি, বাবাও ঠিক ততটুকুই বোঝেন। সত্যি, জানেন, আমার বাবা খুব ভালো। মায়ের কাছে আমি যা পাই না, বাবা তা পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তবে এ-ব্যাপারে একেবারেই কথা বলতে

চান না উনি, মা-র সম্বন্ধে কোন কথা আমার সামনে বলেন না কখনো। বুঝলেন সিস্টার, পুরুষমানুষরা অনেক কাজই করতে পারে, কিন্তু মায়ের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা তাদের নেই।'

'তোমার কথাটাকে ভুল বলতে পারলেই আমি খুশি হতুম ক্যাডি, কিন্তু তা বলতে পারছি না। কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো। তোমাদের মা-মেয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটা যে ঠিক বন্ধুর মতো হয় নি, এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। আচ্ছা, তুমি যখন বড় হয়ে উঠবে, তখন কি অবস্থাটা পাল্টাবে বলে মনে হয়?'

কাঁধ দুটো একটু ঝাঁকিয়ে নিলো ক্যাডি, 'সিস্টার, মায়ের অভাবটা আমার বুকে বড় বাজে। এমন কাউকে যদি পেতুম, যাঁকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবো আর তিনিও আমার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারবেন, তাহলে কি ভালোই না হত!'

গাম্ভীর্যের ছাপ পড়লো সিস্টার অ্যাঙ্কের মুখে। বললেন, 'যাক, এ নিয়ে এখন আর আলোচনা করে লাভ নেই। তবে তুমি তো আমার কাছে সব কথাই বললে। এরপর তোমার মনটা বেশ হাল্কা লাগবে, দেখো।'

একঘেয়ে ভাবে দিনগুলো কেটে যেতে থাকে। অনেকেই দেখতে আসে ক্যাডিকে। ছোট ছোট বন্ধুরা আসে, চেনা-পরিচিত লোকজনরা আসে। কিন্তু প্রায় সারাটা দিন ওকে একা-একাই থাকতে হয়। ওর শরীরটা বেশ সেরে উঠেছে। ডাক্তাররা ওকে উঠে বসার আর বই পড়ার অনুমতিও দিয়েছেন। বিছানার পাশে একটা টেবিল দেওয়া হয়েছে ওর জন্যে। আর ওর বাবা একটা ডায়েরী এনে দিয়েছেন। মাঝে-মাঝে উঠে বসে ও, ডায়েরীতে লিখে রাখে নিজের ভাবনার কথা, অনুভূতির কথা।

ক্যাডি ভাবতেও পারে নি যে এই ডায়েরী লেখার মধ্যে এতটা আনন্দ খুঁজে পাবে ও।

হাসপাতালের জীবনযাত্রা বড় নীরস, একঘেয়ে। রোজ সেই একই নিয়মে একই কাজ, একেবারে ঘড়ি-ধরে চলা, কোথাও কোন ভুলচুক নেই। আর সব কিছু ভীষণ শান্ত, চুপচাপ। এখন তো আর ক্যাডির হাত-পায়ে যন্ত্রণা হয় না, তাই ও চায় আশেপাশে একটু হৈ-চৈ হোক, একটা কিছু ঘটুক-টটুক।

তবু, এ-সব সত্বেও, দিনগুলো যেন হু-হু করে কেটে যাচ্ছে। ক্যাডিকে মোটেই ঠায় শুয়ে থাকতে হয় না। সবাই ওকে নানান খেলনা-টেলনা দিয়ে যায়, ডান হাতটা দিয়ে সেগুলো নাড়া-চাড়া করে ও। ইস্কুলের বইগুলোকেও একেবারে শিকেয় তুলে রাখেনি, সেগুলোতেও রোজ খানিকক্ষণ করে চোখ বুলোয়। এই হাসপাতালে তিন মাস আছে ও। শিগগিরই ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ওর হাড়ের ভাঙা-টাঙাগুলো খুব একটা মারাত্মক নয়। ডাক্তাররা বলছেন—এখন কিছুদিন গ্রামের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে গিয়ে থাকলে ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

পরের সপ্তাহে মিসেস ফান আল্টেন্‌হ্যুফেন এসে ক্যাডির জিনিস পত্রগুলো বেঁধে-ছেঁদে নিলেন। একটা অ্যাম্বুলেন্সে চেপে মায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্য-নিবাসে চললো ক্যাডি। বেশ কয়েক ঘণ্টা যাওয়ার পর, স্বাস্থ্য-নিবাসে পৌঁছলো ওরা। এখানকার দিনগুলো আরো নিঃসঙ্গ। বাড়ির লোকেরা সপ্তাহে দু'একবার করে দেখতে আসে ওকে। সিস্টার অ্যাঙ্কের মতো কেউ নেই এখানে। সবই কেমন অদ্ভুত ধরণের। সুখের খবর শুধু একটাই—খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে ও।

একদিন ওর হাত থেকে ব্যাণ্ডেজটা খুলে দিলেন ডাক্তার। ততদিনে স্বাস্থ্য-নিবাসের জীবনে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ও। ডাক্তাররা ওকে হাঁটার চেষ্টা করতে বললেন। ওহ্, সে বড় সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! দুদিকে দুজন সিস্টারের কাঁধে ভর দিয়ে, এক-পা এক-পা করে হাঁটতে শুরু করল ক্যাডি। রোজই চলতে লাগলো এই কঠিন পরীক্ষা। এই ভাবে হাঁটাহাঁটি করতে করতে ওর পায়ে বেশ জোর ফিরে এল।

বাগানে পায়চারি করার অনুমতিও পেয়ে গেলো ক্যাডি। সঙ্গে থাকতেন একজন সিস্টার, আর হাতে থাকতো একখানা লাঠি। সিস্টার ট্রাস্ সবসময়ই থাকতেন ওর সঙ্গে, আবহাওয়া ভালো থাকলে ওরা দুজনে বিরাট বাগানটার কোন একটা বেঞ্চিতে বসে গল্প-গুজব করতো, কিম্বা বই-টই পড়তো।

শেষ ক'দিন ওরা মাঝে-মাঝে বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতো বাগান পেরিয়ে যে বনটা পড়ে, সেই বনের মধ্যে। বনের মধ্যে গেলে খুশিতে উছলে উঠতো ক্যাডি। সিস্টার তাই কখনো বাধা দিতেন না ওকে। খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হত ক্যাডিকে, বেশি হাঁটাহাঁটি করলে শুরু হত যন্ত্রণা। তবু, এই আধ ঘণ্টা সময়টুকুর জন্তে সারাদিন মুখিয়ে থাকতো ও। খোলা আকাশের নিচে, প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে ও ভাবতো,—আহ্, আবার আমি ভালো হয়ে উঠছি!

সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে ওখানকার সব অলি-গলি পর্যন্ত চেনা হয়ে গেলো ক্যাডির। তখন একদিন ডাক্তার ওকে একা একা বেরোনোর অনুমতি দিলেন। খুশিতে ডগোমগো হয়ে উঠল ক্যাডি, 'সত্যি ?'

ডাক্তার বললেন, 'অবশ্যই। কালকেই বেরিয়ে পড়ো একা একা। দেখো, আর যেন এখানে ফিরতে না হয়'—একটু রসিকতা করলেন ডাক্তার।

পরেরদিন লাঠিখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ক্যাডি। আহা, সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এর আগে পর্যন্ত সবসময় ও সিস্টার ট্রাসের সঙ্গেই বাইরে বেরিয়েছে, আজ ও একা! তবে এই প্রথম দিনটাতে ওকে বাগানের বেড়ার ওধারে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না ডাক্তার। আধঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে, ফিরে এল ক্যাডি। ওর মুখে একটা উজ্বল আভা, বেশ ঝরঝরে, খুশিখুশি দেখাচ্ছে ওকে।

ওয়ার্ড সিস্টার ওকে দেখে বললেন, 'কি, কেমন লাগলো' ?

তারপর থেকে প্রতিদিনই বাগানে ঘুরে বেড়ায় ক্যাডি। একদিন ওকে বেড়া পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হল। স্বাস্থ্য-নিবাসটা লোকালয়ের বাইরে, আশপাশে কোন ঘর-বাড়ি চোখে পড়ে না। মিনিট দশেক হাঁটলে তবে গোটাকতক বড় বড় বাড়ি দেখা যায়।

বেশ একটা বেঞ্চি জুটেছে ক্যাডির! পাশ-রাস্তার ধারে একটা গাছ আছে। সেই গাছটার একখানা ডাল নেমে এসেছে মাটিতে। সেইখানে গিয়েই বসে ক্যাডি, আর পাতবার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে যায় একখানা কম্বল। রোজ সকালে ঐখানে বসে বসে বই পড়ে ও, আর স্বপ্নের জাল বোনে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে হাতের বইখানা নামিয়ে রাখে ও। বসে বসে ভাবে: 'আচ্ছা, এই বইটা আমি পড়ছি কেন? তার থেকে এইখানে বসে বসে চারপাশটা ভালো করে ছাখা, এই

পৃথিবীটা সম্বন্ধে ভাবা, তার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করা তো অনেক ভালো!' চারপাশে চোখে মেলে ক্যাডি। পাখ্-পাখালির মেলা, কত নাম-না-জানা ফুলেদের দোদুল দোলা, ছোট্ট এক-দানা খাবার নিয়ে ছুটে যাওয়া পিঁপড়েদের কারবার—দেখতে দেখতে কেমন এক শান্তির ছায়া নামে ক্যাডির মনে। ওর মনে পড়ে সেই সব দিনগুলোর কথা, যখন ও নিজের খুশিমতো লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়াতো। আর তারই পাশাপাশি ও বুঝতে পারে—হাজার কষ্ট সত্ত্বেও, শরীরে আঘাতটা পেয়ে ওর কিছু লাভও হয়েছে। এই বনভূমি, স্বাস্থ্য-নিবাস আর হাসপাতালের প্রশান্ত দিনগুলোর মধ্যে ও যেন নিজেকে নতুন করে চিনতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে যে ও একজন পরিপূর্ণ মানুষ, আর ওর মধ্যে রয়েছে একান্ত নিজস্ব নানান অনুভূতি, অজস্র ভাবনা।

আচ্ছা, এর আগে পর্যন্ত ক্যাডি এটা বুঝে উঠতে পারেনি কেন? নিজের চারপাশের মানুষদের সম্বন্ধে, এমনকি নিজের মা-বাবা সম্বন্ধেও ও এমনভাবে ভাবতে পারেনি কেন?

কী যেন বলেছিলেন সিস্টার অ্যাক্ষ?—'তোমার মায়ের জীবনে হয়তো এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে, যার জন্যে উনি আর কোন জটিলতার মধ্যে যেতে চান না!' আর তার উত্তরে ও নিজে কী বলেছিল?—'মা-বাবার জীবন সম্বন্ধে একটা মেয়ে আর কতটুকুই বা জানতে পারে?'

প্রশ্নটা নিয়ে ও তো আগে কখনো কিছু ভাবেইনি। তাহলে এত তিক্ত একটা উত্তর দিতে গেলো কেন? এখন হলে কি প্রশ্নটার একই উত্তর দিতো না ও? উত্তরটা কি ভুল? অন্যদের জীবন সম্বন্ধে, নিজের মেয়ে-বন্ধুদের, পরিবারের লোকজনের, শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবন সম্বন্ধে একটা বাচ্চা মেয়ে কী-ই বা জানতে পারে? তাদের শুধু

বাইরের দিকটুকুই তো তার চোখে পড়ে! আচ্ছা, এদের কারুর সঙ্গে কি কখনো কোন গভীর আলোচনা করেছি আমি? কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে গেলো ক্যাডি। কিন্তু, অন্যদের সম্বন্ধে কিছু জানার উপায়টাই বা কী? ভাবতে ভাবতে একটা কথা বুঝলো ক্যাডি—অন্যদের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে, আর তাহলেই তাদের সমস্যার সময় সাহায্য করা যাবে। কিভাবে সাহায্য করা যাবে, জানে না ক্যাডি। কিন্তু এটুকু বুঝতে ওর অসুবিধে হচ্ছিল না যে, মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখলে অনেক শক্তি পাওয়া যায়, ধৈর্য ধরার শক্তি গড়ে ওঠে। ও নিজে এমন কাউকে পায়নি, যার কাছে 'মন খুলে' সব কথা বলা যায়। আর ঠিক সেই জন্যেই মাঝে-মাঝে এক ভয়ঙ্কর একাকীত্বে ভোগে ও। কোন বন্ধু-বান্ধবী কাছে মন খুলে কথা বলতে পারলে এই একাকীত্বটা মুছে যেতো না কি? হ্যাঁ, ভুল আমার হয়েইছে, কিন্তু মা-ও 'কখনো আমাকে বোঝার চেষ্টা করেন নি—ক্যাডির মাথায় এই কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

এমনিতে ক্যাডি খুব হাসি-খুশি ধরণের মেয়ে, কথা বলতেও খুব ভালোবাসে ও। কিন্তু, মন খুলে কথা বলতে না পারার জন্যে কি ও একাকীত্বে ভোগে? না। একাকীত্ব তো অন্য ব্যাপার।

একসময় ওর মনে হল, 'নাহ্, এইসব ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ভাবা-টাবা থাক এখন।' জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করলো ও। এখন তো আর কেউ ওকে ধমকায় না, তাই ও যেন নিজেই নিজেকে একটু ধমকাতে চাইছিলো।

হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ও। এই নিরালা পথে কোনদিন কাউকে আসতে দেখেনি ক্যাডি। চোখে কৌতূহল ঝিকিয়ে উঠলো ওর। কে আসে? এগিয়ে, আরও এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। তারপর, সেই বনভূমির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটি

ছেলে, বছর সতেরো বয়স তার। ক্যাডির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো ছেলেটি, যেন কতদিনের বন্ধু। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে গেলো আবার।

কে ছেলেটা? ঐদিকের বাড়িগুলোর কোনোটাতে থাকে নাকি? তা-ই হবে বোধহয়, ঐ বাড়িগুলো ছাড়া এদিকে আর বাড়ি কোথায়! খানিকক্ষণ এইসব সাত-পাঁচ ভাবলো ক্যাডি। তারপর 'ধুত্তোর' বলে ভুলে গেলো ছেলেটার কথা। কিন্তু তার পরদিন, তার পরদিন করে রোজ সকালে একই সময়ে ছেলেটার সঙ্গে দেখা হতে লাগলো ওর।

সেদিন সকালে বেঞ্চিটাতে বসে ছিলো ক্যাডি। ছেলেটা বেরিয়ে এলো বনের মধ্যে থেকে, সোজা এগিয়ে এসে ক্যাডির হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললো, 'আমার নাম হান্‌স্‌ ডোকার্ট। আমরা দুজনে দুজনকে অনেকদিন ধরেই তো দেখছি, এবার আলাপটা সেরে ফেললে কেমন হয়?'

ক্যাডি জানালো, 'আমার নাম ক্যাডি ফান আল্‌টেন্‌হুফেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুব খুশি হবো।'

'সত্যি? আসলে কি জানো, এই রোজ রোজ এখান দিয়ে যাওয়াটাকে তুমি হয়তো পাগলামি বলে ভাবো, কথা বলতে চাইলে হয়তো রাজি হবে না—এইসব ভাবতুম আমি। কিন্তু ক'দিন ধরে কৌতূহলটা এত বেড়ে গেছে যে ঝুঁকিটা আজ নিয়েই ফেললুম।'

ক্যাডির গলায় মিষ্টি ছোঁয়া লাগলো, 'আমাকে দেখলে কথা বলতে ভয়-টয় করে নাকি?'

'না, এখন অবশ্য তা আর মনে হচ্ছে না', উত্তর দিলো হান্‌স্‌, 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি ঐ বাড়িগুলোর কোনোটাতে থাকতে এসেছো, নাকি স্বাস্থ্য-নিবাসের ? তোমাকে অবশ্য রুগী বলে ঠিক মনে হয় না।'

'মনে হয় না?' ক্যাডি অবাক, 'আমি তো স্বাস্থ্য-নিবাসেই এসেছি। এই পা-টা ভেঙেছিলো, আর এই হাত আর এই পা-টাতেও চিড় ধরেছিলো। সেরে উঠতে মাস ছয়েক লাগবে।'

'বাব্‌বা, এক সঙ্গে এতগুলো চোট?'

'হ্যাঁ, বোকার মতো একটা গাড়ির সামনে পড়ে গেছলুম আর কি। তবে চিন্তার কিছু নেই। এই ছাখো না, তুমিই কি আমাকে রুগী বলে বুঝতে পেরেছিলে?'

হান্‌স্‌ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে আর কথা বাড়ালো না ও। একদিকে আঙুল দেখিয়ে ও বললো, 'ঐ হুইস্‌ ডেনেগ্রয়েনে থাকি আমরা। আমি রোজ রোজ এখান দিয়ে যাই বলে তুমি হয়তো অবাক হও। আসলে এখন ইস্কুলের ছুটি পড়েছে বলে বাড়ি এসেছি কি না, তাই রোজ সকালে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু দেখা-টেখা করতে যাই আর কি। নাহলে যেন দম একেবারে বন্ধ হয়ে আসে।'

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো ক্যাডি। উঠতে একটু কষ্ট হচ্ছিলো ওর। ওকে সাহায্য করার জন্য হান্‌স্‌ চটপট হাত বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু কারুর সাহায্য নিতে ক্যাডি রাজি নয়। ও বললো, 'আরে ঠিক আছে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অভ্যেসটা তো এবার করতে হবে আমাকে।' গত্যন্তর না দেখে ক্যাডির বইটাই তুলে নিলো হান্‌স্‌, আর ঐ অজুহাতেই ক্যাডিকে স্বাস্থ্য-নিবাস পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চললো ও। বেড়ার ধারে এসে পরস্পরকে বিদায় জানালো ওরা, যেন কতোদিনের বন্ধু দুজনে।

পরেরদিন সকালে একটু আগে-ভাগেই হাজির হলো হান্‌স্‌। ক্যাডি মোটেই আশ্চর্য হলো না তাতে। ওর পাশটাতেই বসে পড়লো হান্‌স্‌। এটা-সেটা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে লাগলো ওরা, তবে সে-রকম গভীর কোন আলোচনা-টালোচনা নয়। হান্‌স্‌কে খুব ভালো লেগে গেলো ক্যাডির। দিনকতক পরে ওর মনে হলো—

আচ্ছা, আমরা তো গভীর কোন বিষয় নিয়ে কথা বলি না।

সেদিন সকালে একটু দূরে দূরে বসে ছিলো ওরা। কথাবার্তা তেমন জমে নি, কেমন যেন তাল কেটে গেছে। এ-রকমটা তো কখনো হয় না ওদের। দুজনেই চুপচাপ, সামনের দিকে চোখ পেতে বসে আছে। ক্যাডির মাথার মধ্যে চিন্তার বুনুনি। হঠাৎ ওর মনে হলো, কে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চোখ তুললো ও। অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে হান্‌স্‌। চোখে চোখে মিললো ওদের, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা—বহুক্ষণ, ব-হু-ক্ষণ। তারপর যেন সম্বিত ফিরলো ক্যাডির, চোখ নামালো ও।

'কী এত ভাবছো ক্যাডি, আমাকে বলবে না?' কথা বললো হান্‌স্‌, যেন কত কাছের মানুষ।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ক্যাডি। তারপর বললো, 'আসলে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা খুব শক্ত। বললেও তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না, আমাকে পাগল-টাগল ভেবে বসবে।' বলতে বলতে ক্যাডির মনে কেমন এক বিষণ্ণতার মেঘ জমলো, বুজে এল গলাটা।

'আমাকে তুমি এত কম বিশ্বাস করো ক্যাডি? তুমি তো জানো, আমার মধ্যেও এমন অনেক ভাবনা, অনেক অনুভূতি জমে আছে, যেগুলো আমি কারুর কাছে খুলে বলতে পারি না।'

'না না, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে হান্‌স্‌। কিন্তু ব্যাপারটা বড় শক্ত। কী করে বোঝাই তোমাকে!' মাটির দিকে চোখ নামালো ওরা। দুজনের মুখেই গাম্ভীর্যের ছায়া। ক্যাডি বুঝতে পারছিল—হান্‌স্‌ খুব আঘাত পেয়েছে মনে। একটা দুঃখবোধে ভরে উঠছিল ক্যাডির বুক। হঠাৎ ও বলে উঠলো, 'আচ্ছা, মাঝে-মাঝে তোমারও কি নিজেকে ভীষণ একলা মনে হয়, হান্‌স্‌? মানে, আমি বলতে চাইছি, চারপাশে বন্ধু-বান্ধবরা থাকলেও, মনের মধ্যে নিজেকে কি খুব একলা বলে মনে হয় তোমার?'

হান্‌স্‌ বললো, 'সমস্ত অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরই নিজেকে মাঝে-

মাঝে একলা বলে মনে হয়। কারুর কারুর মধ্যে সেটা খুব জেঁকে বসে। ব্যাপারটা আমার মধ্যেও আছে, কিন্তু কখনো কারুর কাছে সেটা বলতে পারিনি। মেয়েরা তো তবু বন্ধুদের কাছে অনেক কথাই বলতে পারে। ছেলেরা তা-ও পারে না। ভাবে—কে জানে, শুনলে হয়তো সবাই হাসাহাসি করবে।'

হান্‌সের দিকে তাকালো ক্যাডি, 'মাঝে-মাঝে আমি ভাবি—মানুষ একে অপরকে এত কম বিশ্বাস করে কেন, মনের সত্যিকারের কথাগুলো খুলে বলতে পারে না কেন? দু' একটা কথাতেই তো অনেক বড় বড় সমস্যা, অনেক ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যেতে পারে, তাই না?'

আবার ঘনিয়ে এল নীরবতার মেঘ, দুজনেই নির্বাক। তারপর, হঠাৎ যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলো ক্যাডি। শুধোল, 'আচ্ছা হান্‌স, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

'অবশ্যই করি।'

ক্যাডি বললো, 'জানো, আজকাল আমি খুব ঈশ্বরের কথা ভাবি, কিন্তু কখনো কাউকে বলি না। বাড়িতে থাকার সময় রোজ শুতে যাবার আগে আমাকে প্রার্থনা করতে হত। নেহাত অভ্যেসের বশেই কাজটা করতুম আমি। রোজ যেমন দাঁত মাজি, তেমনি রোজ প্রার্থনাও করতুম—এইরকম আর কি। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে কখনো বাস করিনি আমি। মানে, আমার ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান ছিলো না। আমি যা যা চাইতুম, তা আমাকে অন্য মানুষরাই দিতে পারতো। কিন্তু এই দুর্ঘটনাটার পর আমাকে অনেকগুলো দিন একা একা থাকতে হয়েছে, অনেক বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছি আমি। এখানে থাকার প্রথম দিকে একদিন সন্ধ্যেবেলা প্রার্থনা করতে গিয়ে বুঝতে পারলুম—প্রার্থনায় আমার মন নেই, আমি যেন অন্য কিছু ভেবে চলেছি। তারপর থেকে প্রার্থনার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করলুম, শব্দগুলোর গভীর অর্থকে বুঝতে চেষ্টা করলুম। ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারলুম—ওপর থেকে যাকে মনে হয় স্রেফ বাচ্চাদের

একটা প্রার্থনা মাত্র, তার মধ্যে আসলে অনেক গভীর অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। তখন থেকে আমি অন্য অনেক জিনিস নিয়েও প্রার্থনা শুরু করলুম। যে-সব জিনিস আমার চোখে সুন্দর বলে মনে হয়, সেইসব জিনিসের প্রার্থনা। কিন্তু আরেকদিন শোবার আগে প্রার্থনা করতে গিয়ে, আমার মাথার মধ্যে একটা ভাবনা ঝলসে উঠলো বিদ্যুতের মতো। মনে হল—যখন ভালো ছিলুম, তখন তো কোনদিন ঈশ্বরের কথা ভাবিনি আমি! তাহলে এখন তিনিই বা আমার পাশে দাঁড়াবেন কেন? প্রশ্নটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে হান্স্। মনে হচ্ছে, ঈশ্বর কিছুতেই আমার কথা ভাবতে পারেন না।'

হান্স্ বললো, 'তোমার কথার শেষটুকুর সঙ্গে আমি একমত নই ক্যাডি। নিজের বাড়িতে তুমি বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই ছিলে। তখন যে তুমি না-বুঝেশুনে প্রার্থনা করতে, সেটা মোটেই কোন ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। আসলে তুমি গভীরভাবে ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারতে না। আর আজ তুমি বুঝেছো কাকে বলে যন্ত্রণা, কাকে বলে ভয়। তাই তুমি ঈশ্বরকে খুঁজতে চাইছো। যা তোমার হওয়া উচিত বলে মনে করো, তা-ই তুমি হতে চাইছো এখন। ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখো ক্যাডি, তিনি তো বহুজনকেই পথ দেখিয়েছেন।'

ভাবনা-ভরা চোখে সামনের গাছগুলোর দিকে তাকালো ক্যাডি, 'আচ্ছা হান্স্, ঈশ্বর যে আছেন, তা বোঝা যাবে কেমন করে? ঈশ্বর কী? ঈশ্বর কে? কেউ তো কখনো ভাখেনি তাঁকে! মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমি যেন হাওয়ার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, ঈশ্বরের কাছে নয়।'

'তিনি কী, তিনি কে, এ প্রশ্ন যদি করো, তাহলে বলবো—এ প্রশ্ন কাউকে করা চলে না, কারণ উত্তরটা কারুরই জানা নেই। চোখ মেলে চারপাশটা ভাখো। ঐ ফুল, ঐ গাছ, জীব-জন্তু, মানুষ—এই সবকিছুর মধ্যেই তো মিশে রয়েছেন ঈশ্বর! এই আশ্চর্য জীবন, তারপর মৃত্যু,

এই বংশবিস্তার, প্রকৃতি—এ-ই তো ঈশ্বর। তাঁর এইসব সৃষ্টির মধ্যেই ছড়িয়ে আছেন তিনি। এর বেশি আর কিছু জানার তো দরকার হয় না ক্যাডি। মানুষ সেই রহস্যময়ের নাম দিয়েছে—ঈশ্বর। ইচ্ছে করলে কেউ তাঁকে অন্য নামেও ডাকতে পারে। কী আসে যায় তাতে, তাই না?'

ক্যাডি বললো, 'ঠিকই বলেছো তুমি। কথাটা আমিও মাঝে-মাঝে ভাবতুম। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলতেন—তুমি তো দিব্যি সেরে উঠছো, আবার তুমি ভালো হয়ে যাবে, দেখো। আমার মনটা তখন ভরে উঠতো কৃতজ্ঞতায়। সিস্টারদের ওপর, ডাক্তারবাবুদের ওপর কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে যেতো মন। আর কৃতজ্ঞতা বোধ করতুম ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু যখন খুব যন্ত্রণা হত, তখন মনে হত—আমি যাঁকে ঈশ্বর বলি, আসলে তা হচ্ছে মানুষের নিয়তি। প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতো মাথার মধ্যে, কোন উত্তর খুঁজে পেতুম না। নিজেকে জিজ্ঞেস করতুম—কার ওপর বিশ্বাস রাখো তুমি? উত্তর পেতুম একটাই—ঈশ্বরের ওপর। অনেক সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে পরামর্শ চাইতুম, আর সবসময় ঠিক ঠিক পরামর্শ পেতুমও। কিন্তু হান্‌স্‌, আসলে কি উত্তরটা আমার নিজের মধ্যে থেকেই উঠে আসতো না?'

হান্‌স্‌ বললো, 'আমি তো আগেই বললুম ক্যাডি, মানুষ আর অন্য সবকিছুকে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। আত্মা, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা—এ-সবও তাঁরই সৃষ্টি। তোমার প্রশ্নের জবাবে যে উত্তরগুলো তুমি পেতে, সেগুলো তোমার মধ্যে থেকে আসতো ঠিকই, আবার ঈশ্বরের কাছ থেকেও আসতো। কারণ তিনিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, আমার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বর আমার আমার সঙ্গে কথা বলেন?'

'ঠিক তাই। আচ্ছা ক্যাডি, আমরা তো এখন দুজন দুজনকে বিশ্বাস করে অনেক কথাই বললুম। দাও, এবার তোমার হাতটা

আমার হাতে দাও। এখন থেকে আমরা দুজনে দুজনকে বরাবর বিশ্বাস করবো, যে কোন সমস্যায় পড়লে একে অপরকে সব কথা খুলে বলবো—কেমন ?’

নিজের হাতটা এগিয়ে দিলো ক্যাডি। হাতে হাতে ধরে বসে রইলো ওরা, অনেকক্ষণ বসে রইলো। এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে ভরে উঠলো দুজনের মন।

ঈশ্বর নিয়ে কথা বলার পর থেকে ওদের মধ্যে গড়ে উঠলো বড় গভীর এক বন্ধুত্ব। এত গভীর, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। নিজের চারপাশে যা যা ঘটে চলেছে, ডায়েরীতে তা লিখে রাখার অভ্যেসটা ইতিমধ্যে রপ্ত হয়ে গেছে ক্যাডির। নিজের অনুভূতির কথা, ভাবনা চিন্তার কথা, ডায়েরীতে লিখে রাখে ও।

একদিন ও ডায়েরীতে লিখলো : ‘এখন আমার একজন সত্যি-কারের বন্ধু থাকলেও, সবসময় আমি যেন ঠিক হাসি-খুশি থাকতে পারি না। আচ্ছা, অন্য লোকেদেরও কি সবসময় এ-রকম মন-মেজাজ বদলায় ? তবে সারাক্ষণ হাসি-খুশি থাকলে একটা বিপদ ঘটতোই। চিন্তা-ভাবনা করার মতো বিষয়গুলো নিয়ে আমি হয়তো আর তেমন করে মাথা ঘামাতুম না।

‘ঈশ্বর নিয়ে ওর সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল, তা এখনও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। মাঝে-মাঝে বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে কিম্বা বনের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে বেড়াতে ভাবি—আমার নিজের মধ্যে দিয়ে ছাড়া আর কিভাবেই বা ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন ? তারপর আমার ছোট্ট মাথাটার মধ্যে ভীড় করে আসে একরাশ ভাবনা।

‘হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমার সঙ্গে আমার মধ্যে দিয়েই কথা বলেন। কেননা প্রতিটি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে

তিনি তাকে নিজের একটা অংশ দান করেন। এই অংশটুকুই মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে ভালো-খারাপ বোধ, এই অংশটুকু থেকেই তারা নিজেদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে থাকে। ফুলেদের ফুটে ওঠা, পাখিদের গান গাওয়া যেমন প্রকৃতির অঙ্গ, তেমনি প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ঐ অংশটুকুও প্রকৃতিরই অঙ্গ।

'কিন্তু ঈশ্বর মানুষের মধ্যে আবেগ আর আকাঙ্খার বীজও যে বুনে দিয়েছেন! এইসব আকাঙ্খা আর ন্যায়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সব মানুষের গভীরেই চলে।

'এমন একদিন হয়তো আসবে, যখন মানুষ তার আকাঙ্ক্ষার বদলে বিবেকের কথাই বেশি করে শুনবে, মেনে চলবে।'

এদিকে, ইহুদীদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে উঠছিল।

১৯৪২ সালে বহু ইহুদীর জীবনেই ঘনিয়ে এল সর্বনাশের কালো ছায়া। জুলাই মাসে ষোল বছর বয়স্ক ছেলে আর মেয়েদের ডেকে পাঠানো হল, তারপর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বন্দীশিবিরে। আশ্চর্যই বলতে হবে, ক্যাডির বন্ধু মেরীকে কিন্তু ডেকে পাঠানো হল না। কিভাবে যেন বেঁচে গেছলো ওরা। শুধু ছোটরাই নয়, বিপদের থাবা নেমে এল বড়দের ওপরেও। গোটা শরৎকাল আর শীতকালটা জুড়ে নানান সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটে গেলো ক্যাডির চোখের সামনে। প্রতি রাতে রাস্তায় ট্রাকের শব্দ, বাড়িগুলোর দরজায় দরজায় ধাক্কার আওয়াজ আর শিশুদের আর্তনাদ। ক্যাডির বাবা, ক্যাডির মা আর ক্যাডি—বাতির আলোয় পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় ওরা, আর ওদের চোখে-মুখে ফুটে থাকে একটাই জিজ্ঞাসা: 'কাল কাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না?'

ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যে। ক্যাডি ঠিক করলো, মেরীর কাছে গিয়ে

ওকে একটু সাহস-টাহস দেওয়া দরকার। সেদিন সন্ধ্যেয় রাস্তার শব্দের যেন আর শেষ নেই। মেরীদের বাড়ির সামনে গিয়ে তিনবার ঘন্টি বাজালো ক্যাডি। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেরী দেখে নিলো —কে এসেছে। তারপর ক্যাডিকে দেখে দরজা খুললো ও। ভিতরে ঢুকলো ক্যাডি। মেরীদের পরিবারের সকলে বসে আছে এক জায়গায়। জামা-কাপড়, বোঁচকা-বুঁচকি তৈরী, যেন অপেক্ষা করছে সকলে। মুখগুলো ফ্যাকাশে, বিবর্ণ। ক্যাডিকে দেখেও কেউ কোন কথা বললো না। আচ্ছা, মাসের পর মাস, প্রত্যেক রাত্রে, এরা কি এইভাবেই বসে বসে অপেক্ষা করে? আতঙ্কিত, বিবর্ণ মুখগুলোর দিকে চাইতেও যেন ভয় করে। মাঝে-মাঝে অন্য কোন বাড়ির দরজায় ধাক্কা পড়ছে, আর এই মানুষগুলো কেঁপে উঠছে থরথর করে। যেন বাড়ির দরজায় ঘা পড়ছে না, ঘা পড়ছে একেবারে জীবনের দোরগোড়ায়।

দশটার সময় উঠে এল ক্যাডি। ও বুঝতে পারছিল—ঐভাবে বসে থেকে কোন লাভ নেই। এই মানুষগুলো এখন এক অন্য জগতের বাসিন্দা, এদেরকে সাহস যোগানোর ক্ষমতা তার নেই। তবু ওরই মধ্যে মেরীই যা একটু নড়া-চড়া করছে। মাঝে-মাঝে ক্যাডির দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করছিল ও, ছোট ছোট বোনগুলোকে আর মা-বাবাকে কিছু খাওয়ানোরও চেষ্টা করছিল।

ক্যাডিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো মেরী, তারপর বন্ধ করে দিলো দরজাটা। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে এগিয়ে চললো ক্যাডি। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো ও। রাস্তার মোড়টার ওদিকে কাদের যেন পায়ের শব্দ! অনেকগুলো পা, যেন একদল সৈন্য এগিয়ে আসছে গটমট করে। অন্ধকারে ভালো ঠাহর করা যাচ্ছে না। তবু, কারা আসছে, কেন আসছে—বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিলো না ক্যাডির। একটা দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেলো ও, নিভিয়ে দিলো টর্চটা। অন্ধকারে দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকগুলো হয়তো দেখতে

পাবে না। কিন্তু দেখলো। একজন সৈনিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ওর সামনে, উঁচিয়ে ধরলো হাতের পিস্তলটা। জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ ক্যাডির দিকে তাকিয়ে রইলো লোকটা, তারপর শুধু বললো—'আয়।' বলেই ওর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

কোনমতে বলে উঠলো ক্যাডি, 'আমরা খ্রিশ্চান স্যার! আমার মা-বাবা বিশিষ্ট লোক।' সারা শরীরটা কাঁপছে ওর। এই গুণ্ডাটা ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে, কে জানে! আমার পরিচয় পত্রটা কোন রকমে একবার দেখাতেই হবে ওকে—ভাবছিলো ক্যাডি।

'উঁঃ, বিশিষ্ট! কই, দেখি তোর পরিচয়-পত্রটা।' তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে পরিচয়-পত্রটা বার করে দিল ক্যাডি।

সেটার দিকে দেখতে দেখতে লোকটা বললো, 'তা এ-কথা আগে বলতে কী হয়েছিল। যত্তোসব উজবুকের দল!' তারপর, কিছু বুঝে ওঠার আগেই, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ক্যাডি। নিজের ভুলটা শোধ-রানোর জন্যে 'বিশিষ্ট খ্রিশ্চান মেয়েটি'কে সজোরে লাথি মেরেছে জার্মানটি। জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে উঠে পড়লো ক্যাডি, দ্রুতপায়ে হেঁটে চললো বাড়ির দিকে।

তারপর টানা সাতটা দিন মেরীর কাছে যাওয়ার আর ফুরসৎ পেলো না ক্যাডি। আটদিনের দিন ও মরিয়া হয়ে উঠলো, কাজকর্ম সব ফেলে রেখে পা বাড়ালো মেরীদের বাড়ির দিকে। কিন্তু মেরীদের বাড়িতে পৌঁছনোর আগে থেকেই ওর মন বলছিলো—মেরীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। সত্যিই তাই। মেরীদের বাড়ির দরজার সামনে গিয়েও দেখলো—দরজাটা সীল্ করে দেওয়া হয়েছে। এক ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লো ক্যাডি। মনের মধ্যে তোলপাড় চললো, 'মেরী এখন কোথায়? কোথায়?'

আর দাঁড়ালো না ও। পড়ি-মরি করে ফিরে এল বাড়িতে। নিজের ছোট্ট ঘরটায় ছুটে ঢুকে পড়ে, দরজাটা বন্ধ করে দিলো। পোশাক-টোশাক না খুলেই শুয়ে পড়লো বিছানায়. আর ভাবতে

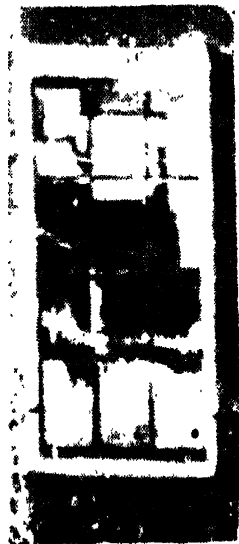
লাগলো মেরীর কথা। ভেবেই চললো, ভেবেই চললো।

আমি তো থাকবো এখানেই, তাহলে মেরী কেন থাকতে পারবে না? আমি থাকবো আনন্দে, আর মেরীকে কেন এত দুঃখ সইতে হবে? আমাদের দুজনের মধ্যে তফাৎটা কী? দুজনে তো আমরা একইরকম! মেরী কী অন্যায়টা করেছে? এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন ওর চোখের সামনে ফুটে উঠলো মেরীর ছোট্ট শরীরটা— একটা কুঠ্‌রিতে আটকে রাখা হয়েছে মেরীকে, পরণে ছেঁড়া ন্যাকড়া, মুখখানা শুকনো, শীর্ণ। চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে, আর তা থেকে ঠিকরে পড়ছে একটা করুণ আভা আর তিরস্কার। সেই চোখের সামনে দাঁড়াতে পারছিলো না ক্যাডি। হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো ও, শরীর নিঙড়ে উঠে এল কান্না। চোখের জলে ভিজে উঠলো ওর গোটা শরীরটা। বারবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে মেরীর মিনতিভরা চোখ দুটো, যে চোখ প্রার্থনা করছে সাহায্য, একটু সাহায্য, আর সেই সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ক্যাডির নেই।

'ক্ষমা কর মেরী, ক্ষমা কর, ফিরে আয়......'

চারপাশে মানুষের যন্ত্রণা। কী বলবে, কী করবে—ক্যাডি জানে না। ওর কানের কাছে শুধু দরজা ধাকানোর শব্দ আর শিশুদের আর্তনাদ। একদল বর্বর মানুষকে দেখেছে ও, হাতে তাদের হাতিয়ার। এদেরই একজন তাকে ফেলে দিয়েছিল রাস্তায়। আর এইসব বর্বর মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মেরী, অসহায়, একাকী। মেরী, যে ঠিক ক্যাডিরই মতো, দুজনের মধ্যে কোন তফাত নেই।

প্রবন্ধ


দাগ

২৩ মার্চ, ১৯৪৪

আচ্ছা, খুব ঝকঝকে, বিলাসবহুল বাড়িতে যারা বাস করে, তারা কি কখনও ভিখিরির যন্ত্রণা বোঝে ? ঐ-সব 'ভালো মানুষেরা' কি কখনও তাদের চারপাশের গরীব মানুষদের সম্বন্ধে, অসহায় শিশু-গুলোর সম্বন্ধে নিজেদেরকে প্রশ্ন করে ? হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে অবশ্য সকলেই ভিখিরিদের দু'চার পয়সা দিয়ে থাকে। কিন্তু, কিভাবে দেয় ? তড়ি-ঘড়ি করে পয়সাটা কোনরকমে ভিখিরির হাতে ফেলে দিয়ে, দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ভিখিরির হাতে কোনরকমে নিজের হাতটা ঠেকে গেলে, দাতামশাই আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন। এই কথাটা সত্যি, নাকি সত্যি নয় ? ভিখিরিদের অভদ্রতা নিয়েও লোকে নানা প্রশ্ন তোলে। যাদেরকে কেউ মানুষ বলেই মনে করে না, মনে করে পশু বলে, তারা অভদ্র হবে না তো আর কে হবে ?

চমৎকার সামাজিক রীতিনীতি আর উচ্চ আদর্শের দাবী করে যে দেশ, সেখানে একজনের প্রতি অন্যের এই আচরণ খুব খারাপ, খুবই খারাপ ব্যাপার। স্বচ্ছল লোকেদের মধ্যে অনেকেই মনে করে— ভিখিরিরা হচ্ছে ঘৃণ্য জীব, নোংরা, অভদ্র, অসভ্য। কিন্তু কেন এরকম পরিণতি হয়েছে বেচারাদের, তা কি তাঁরা কখনও ভেবে দেখেছেন ? নিজের সন্তানদের সঙ্গে একবার ঐ হতভাগ্য ছেলে-মেয়েগুলোর তুলনা করে দেখুন। তফাৎটা কোথায় বলুন তো ? আপনার ছেলে-মেয়েরা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট। আর ওরা নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। ব্যস, এটুকুই ? হ্যাঁ, এটুকুই। এটুকুই তফাৎ। কোন ভিখিরির

সন্তানও যদি ভালো খেতে বা ভালো পোশাক-আশাক পেতো, আদব-কায়দা শিখতে পারতো—তাহলে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকত না।

জন্মসূত্রে আমরা সকলেই সমান, কিন্তু ওরা বড় অসহায়। ওরা নিষ্পাপও বটে। একই বাতাস থেকে শ্বাস নিই সকলে, বহু জন বিশ্বাস করি একই ঈশ্বরকে। তবু, তবু এই বিপুল পার্থক্য, কারণ বেশির ভাগ মানুষ বোঝেই না তফাৎটা আসলে কোথায়। এইটুকু বুঝলেই তারা দেখতে পেতো—আসলে কোন তফাৎই নেই! একই-ভাবে জন্মেছে সকলে, একদিন না-একদিন মারা যেতে হবে সকলকেই, এই পার্থিব গৌরবের ছিটে-ফোঁটাও থাকবে না কোথাও। অর্থ, ক্ষমতা, যশ—কতক্ষণ তার আয়ু? শুধু কয়েকটা বছর! এইসব অস্থায়ী জিনিসের জন্য কেন মানুষ মাথা ফাটাফাটি করে? কেন নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসগুলো অন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় না? পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার এই কয়েকটা বছর কিছু মানুষকে এত কষ্ট করে কাটাতে হয় কেন? আর, দ্যাখো, যা-কিছু দিতে হয়, তা ভালোভাবে দাও, মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ো না। ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকার তো সকলেরই আছে! কোন ধনী মহিলার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করবো, আর কোন দরিদ্র মহিলার সঙ্গে করবো রূঢ় ব্যবহার—এমনটা কেন হবে? এই দুজনের চরিত্রের পার্থক্যটা যে কী, তা কি কেউ খুঁজে দেখার চেষ্টা করে? অর্থ কিম্বা ক্ষমতার ওপর মানুষের সত্যিকারের মহত্ব নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার চরিত্র আর গুণের ওপর। আমরা প্রত্যেকেই মানুষ, প্রত্যেকের মধ্যেই নানান দোষত্রুটি আছে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনেক ভালো গুণও আছে। যদি এই ভালো গুণগুলোকে নষ্ট না করে বাড়িয়ে তোলা যায়, তাহলে আমরা গরীবদেরকেও মানুষ বলে ভাবতে শিখবো। আর তার জন্যে কোন টাকা-পয়সা ধন-দৌলতের দরকার হয় না।

ছোট ছোট জিনিস দিয়েই সবকিছু শুরু হয়। যেমন, ট্রামে চড়ে

যাওয়ার সময় কোন ধনী বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলে যেমন নিজের আসনটা ছেড়ে দাও, তেমনিভাবেই বসতে দাও গরীব বয়স্কা মহিলাদেরও। কোন ধনী মহিলার পা মাড়িয়ে দিলে যেমন বলো 'দুঃখিত', তেমনি ভাবেই দুঃখ প্রকাশ করো কোন গরীব মহিলার পা মাড়িয়ে দিলেও। মানুষ সবসময়েই ভালো দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চায়। সেই দৃষ্টান্ত তুমিই সৃষ্টি করো ; দেখবে, অন্যরাও সেইমতো কাজ করবে। এইভাবে চললে মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে বন্ধুত্ব, সবার মধ্যে জন্ম নেবে উদারতা। তখন আর কেউ গরীবদের হেয় করবে না, হীন মনে করবে না।

আহা, সেই উজ্বল দিনে যদি আমরা এখনই পৌঁছে যেতে পারতুম! আমাদের এই দেশ, এই ইয়োরোপ মহাদেশ আর সারা দুনিয়া যদি এখনই অনুভব করত যে, মানুষ মানুষের জন্য, সব মানুষই সমান, আর বাদবাকি সবকিছু নিতান্তই ক্ষণিকের, সাময়িক—তাহলে কী ভালোই না হত!

ভাবতে ভালো লাগে যে আর অপেক্ষা করার দরকার নেই, এখনই, এই মুহূর্তেই শুরু হবে আমাদের যাত্রা, শুরু হবে ধীরে ধীরে পৃথিবীটাকে পাল্টে দেওয়ার অভিযান! ভাবতে ভালো লাগে—পৃথিবীর বুকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে ছোটবড় সকলেই! বেশির ভাগ লোকই শুধু নিজের জন্য ন্যায় খোঁজে, না পেলে অসন্তুষ্ট হয়। চোখ মেলে ছাখো, নিজের কাজের ন্যায্যতা সম্বন্ধে প্রথমে নিশ্চিত হও। দাও, যতটা পারো দিয়ে যাও। সব সময়ই কিছু-না-কিছু দিয়ে যাওয়া যায়, অন্তত দয়াটুকু তো দেওয়াই যায়, তাই না? সবাই যদি এইভাবে চলে, ছড়িয়ে দেয় দয়ার ফুল, তাহলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে ন্যায়, ফুটে উঠবে ভালোবাসার আলো। দিয়ে যাও, তাহলে তুমিও পাবে, অনেক কিছু পাবে। এত পাবে, যা তুমি ভাবতেও পারবে না। দাও, দাও, দিয়ে যাও, আরো আরো, সাহস হারিয়ো না, অক্লান্তভাবে চালিয়ে যাও দেওয়ার

কাজ! কোন কিছু দিয়ে কেউ কখনও গরীব হয়নি। এইভাবে চললে আমাদের কয়েক পুরুষ পরে আর ভিখিরি ছেলেমেয়েদের দয়া করার দরকার হবে না, কেননা তখন আর কেউ ভিখিরি থাকবে না!

এই পৃথিবীর বুকে প্রত্যেকের জন্যই যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। আছে যথেষ্ট অর্থ, সম্পদ, সৌন্দর্য। সবাই মিলে ভাগ করে নিতে হবে সবকিছু। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জন্যই বহুকিছু সৃষ্টি করেছেন। এসো, সে-সব সম্পদ আমরা সবাই মিলে সমানভাবে ভাগ করে নিই।

কেন ?

ছোট্ট একটা শব্দ—'কেন ?' অথচ এই ছোট্ট শব্দটা আমার মনে সেই ছোটবেলা থেকেই (ঠিকমতো কথা বলতেও শিখিনি তখন) একেবারে চেপে বসেছে। সব বিষয়েই বাচ্চারা যে নানান প্রশ্ন করে, এ তো সবাই জানে। আসলে বাচ্চাদের কাছে সবকিছুই তো অজানা, অচেনা। তাই তারা সবকিছু জানতে চায়। আমারও ঠিক তা-ই হয়েছিল। বড় হয়েও এ অভ্যেসটা আমার আর গেল না—তা সে উত্তর পাই বা না পাই। এমনিতে ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। আমার মা-বাবাও খুব ধৈর্যের সঙ্গে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, যতদিন না……। অচেনা লোকদেরকেও প্রশ্নের ঠ্যালায় জ্বালাতন করতে শুরু করি আমি, আর তারা সাধারণত 'ওহ্, বাচ্চাদের প্রশ্নের আর শেষ নেই' ভেবে বিরক্ত হয়ে উঠত। হ্যাঁ, মানছি, ব্যাপারটা বিরক্তিকর। তবে কিনা, 'জানতে হলে জিজ্ঞেস করতেই হবে'—এই কথাটাই আমার সান্ত্বনা। কিন্তু এ কথাটাও পুরোপুরি সত্যি নয়। সত্যি হলে এতদিনে আমি কোন কলেজের অধ্যাপিকা-টধ্যাপিকা হয়ে যেতুম !

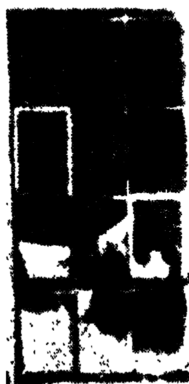
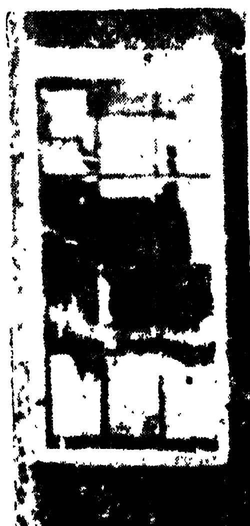
বড় হতে হতে বুঝলুম—সবাইয়ের কাছে সব ধরণের প্রশ্ন করা সম্ভব নয়, আবার অনেক 'কেন'-র কোন উত্তরও দেওয়া যায় না। তখন থেকে এইসব প্রশ্ন নিয়ে আমি নিজে নিজেই ভাবতে শুরু করি। আর এই ভাবনার পথ বেয়েই একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য আবিষ্কার করে ফেললুম আমি—যে-সব প্রশ্ন কাউকে করা যায় না, সে-সব প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজেই খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ঐ ছোট্ট 'কেন' শব্দটা আমাকে শুধু প্রশ্ন করতেই শেখায়নি, শিখিয়েছে চিন্তা করতেও।

এবার 'কেন' শব্দটার দ্বিতীয় দিকটা দেখা যাক। যে-কোন কাজ

করার আগে মানুষ যদি নিজের কাছেই প্রথমে প্রশ্ন করে—'কেন' ?—তাহলে কেমন হত ? তাহলে মানুষ আরো সৎ, আরো ভালো হয়ে উঠত। কেননা সৎ আর ভালো হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে অবিরাম নিজেকে পরীক্ষা করে চলা। নিজেদের ভুলত্রুটিগুলোর কথা খারাপ দিকগুলোর কথা (যা প্রত্যেকেরই থাকে) স্বীকার করতে লোকে একেবারেই নারাজ। এ ব্যাপারে ছোট-বড় সবাই সমান। বেশির-ভাগ লোকই ভাবে যে মা-বাবার উচিত হচ্ছে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া আর তাদের চরিত্রকে যতটা সম্ভব উন্নত করে তোলার চেষ্টা করা। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই ভুল। ছোটরা যাতে একেবারে গোড়া থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে পারে আর নিজেদের সত্যিকারের চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে পারে—তারই চেষ্টা করা উচিত। অনেকে এটাকে হুজুগে ব্যাপার বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। ছোট্ট শিশুও কিন্তু একজন মানুষ, একটা ব্যক্তিত্ব, তারও একটা বিবেক থাকে। এগুলো মনে রেখেই তাকে গড়ে তোলা দরকার, যাতে করে সে কোন অন্যায় করলেই তার বিবেক তাকে জাগিয়ে দিতে পারে কঠোরভাবে। ছেলেমেয়েরা চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে পৌঁছে গেলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার আর কোন মানে হয় না। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা ভালোমতই বুঝতে পারে যে শাস্তি দিয়ে বা মার-ধোর করে কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না—মা-বাবাও নয়। তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, ভুলত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিতে হবে। ফল পাওয়া যাবে এতেই। শাস্তি দিয়ে কোন লাভ নেই।

যাক, আমি পণ্ডিতী ফলাতে বসিনি। আমি শুধু বলতে চাইছি যে প্রতিটি শিশুর জীবনে, প্রতিটি মানুষের জীবনে ঐ ছোট্ট শব্দ 'কেন'-র একটা বিরাট ভূমিকা আছে। 'জানতে হলে জিজ্ঞেস করতেই হবে' কথাটা ততক্ষণ পর্যন্তই সত্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। আর চিন্তা মানুষকে কখনও খারাপ করে না, বরং আরও উন্নত করে তোলে

স্মৃতিকথা ও গল্প


মনে পড়ে?

আমার ইস্কুলের দিনগুলোর স্মৃতি

৭ জুলাই, ১৯৪৩

মনে পড়ে? আহা, সেইসব সুখে-ভরা হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা! কত কত ঘণ্টাই না কেটে গেছে স্কুলের কথা বলে, মাস্টারমশাইদের কথা বলে, আমাদের সব রোমাঞ্চকর ব্যাপার-স্যাপারের কথা বলে! আর হ্যাঁ, ছেলেদের সাথে আড্ডা মেরেও কেটে গেছে কত না শিহরণ জাগানো প্রহর। আমাদের জীবনটা যখন স্বাভাবিক ছিল, আর পাঁচজনের মতই চলছিলো, তখন সবকিছুই ছিল কতো মধুময়। উচ্চবিদ্যালয়ের সেই একটা বছর আমার সামনে সাজিয়ে দিয়েছিল সুখের এক স্বর্গ-ছোঁয়া ডালি। সবকিছুই ছিল স্বপ্নময়—মাস্টারমশাইরা, তাঁদের শিক্ষা, রঙ্গ-রসিকতা, আর প্রণয়োন্মুখ ছেলের দল—ভালোবাসার প্রথম স্বাদ, সবকিছু।

মনে পড়ে সেই দিনটার কথা, যেদিন আমি বাড়িতে ফিরে দেখলুম চিঠির বাক্সোয় পড়ে আছে একখানা মোড়ক, তার ওপরে লেখা 'ডুন্ অ্যামি—আর'? কে পাঠিয়েছে? নির্ঘাৎ রব্, আর কে হবে। একেবারে হাল-ফ্যাশানের একখানা ব্রোচ ছিল মোড়কটার মধ্যে, যার দাম হবে কম করেও অন্তত আড়াই গিল্ডার[১]। রবের বাবার তো ঐ-সব জিনিসেরই ব্যবসা ছিল। দু'চারদিন পরেছিলুম, তারপর ভেঙে গেলো ওটা।

মনে পড়ে, কিভাবে আমি আর লিস্ ক্লাসের সকলকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলুম? আমাদের ফরাসী ভাষার একটা পরীক্ষা ছিল। আমি বেশ ভালো মতই সেদিন তৈরি হয়ে গেছলুম, কিন্তু

লিস্‌টা কিচ্ছু পড়ে আসে নি। আমার খাতা দেখে ঝাড়া টুকে গেলো ও, আমি আবার নানা ফন্দি-ফিকির করে ওর বানান টানানগুলোও শুধরে দিলুম! আমার ঐসব শোধরানোর ফলেই বোধহয় ওর উত্তরটা আমার থেকেও যেন একটু বেশী ভালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হায়! মাস্টারমশাই আমাদের দুজনের জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন দু'খানা পেল্লাই গোল্লা। ওহ্, উনি ঠিক ধরে ফেলেছিলেন ব্যাপারটা! তা, আমরা দুজন তখন হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানালুম। তাঁর সঙ্গে কথা-টথা বলবার পর, লিস্ হঠাৎ বোকার মত বলে বসলো, 'আপনি তো জানেন না স্যার, ক্লাসের সব্বাই লুকিয়ে লুকিয়ে বই খুলে টুক্‌লিফাই করেছে।'

ওর-কথা শুনে হেডমাস্টার মশাই ক্লাসে এসে বললেন—যারা যারা বই দেখে টুকেছে, তারা যদি হাত তুলে জানান্ দেয়, তাহলে তাদেরকে তিনি কিছু বলবেন না। দশটা মাত্র হাত উঠলো। আসলে টুকলিফাই-করিয়েদের মধ্যে আদ্ধেকেরও বেশি জন হাতই তোলে নি। দু' একদিন পরে হঠাৎই আবার নতুন করে আমাদের ফরাসী ভাষার পরীক্ষা নেওয়া হলো। ব্যস, আমাকে আর লিস্‌কে সকলে বিশ্বাসঘাতক বলে সাব্যস্ত করে ফেললো। বন্ধু-বান্ধবরা তারপর আমাদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করতে শুরু করলো, তা আর কহতব্য নয়। তখন আমাদের ১৬ বি ক্লাসের সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিরাট একখানা মিনতি-ভরা চিঠি লিখলুম আমি। হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই মিটে গেলো ব্যাপারটা, কেউ আর ও-সব মনে রাখলো না।

চিঠিটা ছিল মোটামুটি এ-রকম :

১৬ বি ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি,

ফরাসী ভাষার পরীক্ষার ব্যাপারে আনা ফ্রাঙ্ক ও লিস্ গুসেন্স যে কাপুরুষোচিত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার জন্য তারা গোটা ক্লাসের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছে।

ঐ অন্যায় কাজটা আমরা আগে থাকতে ভেবে চিন্তে করিনি,

হঠাৎই হয়ে গেছে। আর আমরা একবাক্যে স্বীকার করি যে, ঐ ব্যাপারে শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল শুধুমাত্র আমাদের দুজনের। রাগের মাথায় অনেকের মুখ দিয়েই এমন অনেক কথা বেরিয়ে পড়ে, যার ফলাফল মোটেই ভালো হয় না। কিন্তু তাই বলে কারুর ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। আমরা আশাকরি ১৬-বি ক্লাস গোটা ব্যাপারটাকে এইভাবেই দেখবে, খারাপের বদলে ভালো দিক-টাকেই গুরুত্ব দেবে। এ ব্যাপারে এখন তো আর কিছুই করার নেই, এবং দোষী বালিকাদ্বয় এখন আর কিভাবেই বা নিজেদের ভুল কাজটাকে ফিরিয়ে নিতে পারে?

কৃতকর্মের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত না হলে আমরা এ চিঠি লিখতুম না, যারা আমাদেরকে এখনও পর্যন্ত 'বর্জন' করে চলেছে, তাদেরকে বলি—ব্যাপারটা তোমরা আর একবার ভেবে ছাখো। কারণ আমরা তো ঠাণ্ডা মাথায় এমন কোন শয়তানি করি নি, যার জন্যে সারাজীবন আমাদেরকে তোমরা অপরাধী হিসেবে দেখতে পারো। আর যারা আমাদেরকে মার্জনা করতে রাজি নও, তাদেরকে বলি—তোমরা আমাদেরকে প্রচণ্ড বকুনি দাও, কিম্বা ইচ্ছে হলে কোন বিশেষ কাজ করতে বলো। সম্ভব হলে আমরা নিশ্চয়ই সে-কাজ করবো। আশাকরি ১৬-বি ক্লাসের সকলেই ঐ ব্যাপারটাকে ভুলে যাবে।

আনা ফ্রাঙ্ক এবং লিস্ গুসেন্স

মনে পড়ছে, ট্রামের মধ্যে পিম্ কেমন ভাবে রব্‌কে বলেছিলো যে অ্যানকে দেখতে ডেনিস-এর চেয়ে অনেক সুন্দর, বিশেষ করে অ্যান যখন হাসে তখন তাকে আরও সুন্দর দেখায়? ঐ ট্রামেই ছিলো স্যানি, পিমের কথাটা শুনতে পেয়ে ও-ই আমাকে সেটা বলে দিয়েছিল। আর রব উত্তর দিয়েছিল, 'সত্যি পিম্, তোর নাকের ফুটোগুলো কী ঢাউস ঢাউস রে।'

মনে পড়ে, মোরি ওর বাবাকে বলবে ভেবেছিল—বাবা, তুমি কি তোমার এই মেয়েটার সঙ্গে একটু বেশী সময় থাকতে পারো না?

মনে পড়ে, রব যখন শরীর খারাপ করে হাসপাতালে পড়ে ছিলো, তখন আনা ফ্রাঙ্ক আর রবের মধ্যে কত ঘন ঘন চিঠি চালাচালি হয়েছিলো ?

মনে পড়ে, শ্যাম্ আমাকে ওর সাইকেলে বসানোর জন্যে কেমন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছিল, আর আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলো ?

মনে পড়ে, যখন আমি ত্রাম্‌কে বলেছিলুম যে ওর আর সুজি-র মধ্যেকার ব্যাপার-স্যাপারের কথা কক্ষনো কাউকে বলবো না, তখন ও আনন্দে কিভাবে আমার গালে চকাস্ করে চুমু খেয়েছিলো ?

আহা, সেইসব সুখে-ভরা, নিশ্চিন্ত সোনালী দিনগুলো আমার কি ফিরে আসতে পারে না!

উচ্চবিদ্যালয়ে প্রথম দিন

১১ আগস্ট, ১৯৪৩

বিস্তর হল্লা-গোল্লা, কূট কচালি আর জল্পনা কল্পনার পর, শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো—আমি এবার উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবো! আর তার জন্যে আমাকে কোন প্রবেশিকা পরীক্ষাও দিতে হবে না! পড়াশোনায় তো খুব ভালো ছিলুম না, সব বিষয়েই কাঁচা, আর অঙ্কে তো যাকে বলে একেবারে মাথা নেই হয়েছি পাগল! উচ্চবিদ্যালয়ের জ্যামিতির পাঠক্রমটা যেন ইয়া বড়ো হাঁ করে দাঁত খিঁচোতে লাগলো আমাকে, ভয়ে হাত পা হিম হয়ে উঠলো আমার।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে ডাক মারফৎ এসে হাজির হলো সেই বহু প্রত্যাশিত পত্রখানা, অক্টোবরের একটা নির্দিষ্ট দিনে উচ্চবিদ্যালয়ে গিয়ে আমার মুখখানা দেখাতে হবে। আর অক্টোবরের ঠিক সেই দিনটাতেই সে কী আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি! সাইকেলে করে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, অগত্যা অন্য আরও অনেকের সঙ্গে ট্রামে চেপেই রওনা হওয়া গেলো।

স্কুলে সেদিন সাঙ্ঘাতিক ভীড়। গাদা গাদা ছেলে মেয়ে মহানন্দে বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প গুজব করছে। কেউ কেউ ইতি উতি ঘোরাঘুরি করছে, আর পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, চেনা জানা কাউকে দেখতে পেলেই শুধোচ্ছে, 'কিরে, কোন্ ক্লাসে ভর্তি হলি'?

আমি কিন্তু এক ঐ লিস্ গুসেন্স ছাড়া এমন আর কোন চেনা-পরিচিতি ছেলে মেয়েকে দেখতে পেলুম না, যে আমার সঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি হবে। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছিলো না।

একসময় ইস্কুলের দরজা খোলা হলো। ক্লাস ঘরে একজন বৃদ্ধা দিদিমণি আমাদের স্বাগত জানালেন। তাঁর মুখখানা মেটে-রঙা, গায়ে লম্বা পোশাক আর পায়ে চ্যাপ্টা-গোড়ালিওয়ালা জুতো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে হাত ঘষছিলেন তিনি, আর ছাত্র-ছাত্রীদের হৈ-হট্টগোলের মধ্যেই নিয়মমাফিক ঘোষণার কাজটা সেরে নিচ্ছিলেন। এরপর আমাদের নাম ধরে ডাকতেন, শুরু করলেন। নামগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা মিলিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি, তারপর বলে দিলেন কী কী বই-পত্তোর কিনতে কাটতে হবে, আরও অনেক সব টুকিটাকি কথা। ক্লাস শেষ হতেই আমাদেরকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো।

সত্যি বলতে কি, এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। ভেবেছিলুম আজ অন্তত রুটিনটাও দেখতে পাবো, আর হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবো। অবশ্য একজন হাসি-খুশি মুখের মোটা বেঁটে লোককে একটা হলঘরে বসে থাকতে দেখেছিলুম। গাল দুটো তাঁর লাল-রঙা। সবার দিকে চেয়ে হাসছিলেন তিনি, আর তাঁরই মতন বেঁটে মাপের আর একজন লোকের সঙ্গে কথা কইছিলেন। এই ভদ্রলোকের চেহারাটা কিন্তু রোগা রোগা, গম্ভীরপানা মুখ, মাথার চুলগুলো রেশমের মত, আর চোখে ভারী চশমা। তখন কি আর জানতুম যে ঐ মোটা ভদ্রলোক হচ্ছেন স্কুল বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক, আর ঐ রোগা মতন ভদ্রলোকটিই আসলে আমাদের হেডমাস্টারমশাই।

বাড়িতে ফিরে এসে স্কুল সম্বন্ধে খুব লম্বা চওড়া কথা বললুম। কিন্তু আসলে তো সব ঢুঁ ঢুঁ! ইস্কুল সম্বন্ধে, মাস্টারমশাইদের সম্বন্ধে, ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে, কিম্বা ক্লাস রুটিন-টুটিন সম্বন্ধে আমি তখনও বলতে গেলে কিছুই জানি নি।

এক সপ্তাহ পরে ক্লাস শুরু হলো। সেদিনও একেবারে উম্রি-ঝুমরি বৃষ্টি। কিন্তু আমার ঐ এক গোঁ—সাইকেলে চেপেই স্কুলে যাবো। মা ব্যাগের মধ্যে একটা বর্ষাতি গুঁজে দিলেন, যাতে ভিজে একেবারে জাব না হয়ে যাই। সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম।

ওহ্, সাইকেল চালায় বটে মারগট্। একেবারে বাঁই বাঁই করে ছুট লাগায়, ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যেই বেদম হয়ে পড়লুম আমি। ওকে একটু আস্তে আস্তে চালাতে বললুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টিটা চেপে এলো একেবারে আর তার সঙ্গে সে কী ঝড়! মনে পড়লো—ব্যাগের মধ্যে মা বর্ষাতিটা দিয়ে দিয়েছে সাইকেল থামিয়ে বার করলুম বর্ষাতিটা। বিস্তর কায়দা কসরৎ করে ঐ উদ্‌ভুট্টে পোশাকটাকে গায়ে গলানো গেলো। আবার সাইকেল। কিন্তু জোরে চালাতে গিয়ে আবার বেদম হয়ে পড়লুম। আস্তে চালাতে বললুম মারগট্‌কে। নাক টানতে টানতে মারগট্ বললে —'এবার থেকে আমি আলাদাই যাবো'। আসলে ও ভাবছিল পৌঁছতে বুঝি দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না, বেশ আগে-ভাগেই পৌঁছে গেলুম আমরা। সাইকেল দুটো রেখে দিলুম স্ট্যাণ্ডে। তারপর, যে রাস্তাটা চলে গেছে অ্যাম্‌স্টেল নদীর দিকে, তার একটা ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে দুজনে খানিকক্ষণ গল্প গুজব করলাম।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় স্কুলে ঢুকলুম আমরা। ঢুকেই দেখি নোটিশ ঝোলানো—কুড়িজন ছাত্র ছাত্রীকে তাদের ক্লাস ঘর বদল করতে হবে। ঐ কুড়িজনের মধ্যে আমার নামও ছিল। আমাকে যেতে হবে ১৬-বি ক্লাসে। ঐ ক্লাস ঘরে যারা বসে, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছেলে-মেয়ে আমার চেনা। কিন্তু লিস্ আর আমার সঙ্গে থাকতে পারলো না। ওকে সেই ১২-এ ক্লাস ঘরেই রেখে দেওয়া হলো।

ক্লাসঘরে ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে একটা ডেস্ক আমার ভাগে পড়লো। আমার সামনে বসেছে সব ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা মেয়েরা। খুব একলাটি মনে হতে লাগল নিজেকে। পরের ক্লাসে হাত তুলে মাস্টারমশাইকে বললুম—আমাকে অন্য জায়গায় বসতে দিলে ভালো হয়, এখানে বসে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

মাস্টারমশাই না করলেন না। তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সামনের একটা ডেস্কে সরে এলুম আমি। তৃতীয় ঘণ্টায় ছিল শরীর চর্চার ক্লাস। দিদিমণিকে আমার খুব ভালো লেগে গেলো। সাহস পেয়ে লিস্‌কে আমাদের ক্লাসে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বললুম তাঁকে। তিনি কী করেছিলেন জানি না আমি। কিন্তু পরের ঘণ্টাতেই লিস্‌ এসে হাজির হলো আমাদের ঘরে। আমার পাশের ডেস্কটাতেই বসতে দেওয়া হলো ওকে।

ব্যস, আর কোন অসুবিধে নেই। স্কুলটাকে দিব্যি ভালো লেগে গেলে আমার। এই স্কুলেই কত না মজার দিন কেটেছে, শিখেওছি কত কিছু। ভূগোলের মাস্টারমশাই ভূগোল পড়াচ্ছিলেন। মন দিয়ে শুনতে লাগলুম।

জীববিদ্যার ভাষণ

১১ আগস্ট, ১৯৪৩

হাতে হাত ঘষতে ঘষতে ঘরে ঢুকলেন তিনি। হাতে হাত ঘষতে ঘষতেই বসলেন তিনি চেয়ারে। হাতে হাত ঘষা, হাতে হাত ঘষা, ঘষা আর ঘষে চলা।

জীববিদ্যার শিক্ষয়িত্রী মিস রিগেল। ছোটখাট চেহারা, গায়ের রঙ ধূসর, চোখ দুটো ছাই-নীল রঙের, ঢাউস নাক, ছোট্ট ছুঁচোলো মুখ। তাঁর পিছু পিছু আর একজন ঢুকলো একখানা মানচিত্র হাতে ও একটা নরকঙ্কাল নিয়ে।

চুল্লীর পাশে উষ্ণজায়গায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে মিস রিগেল পড়াতে শুরু করলেন। প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে নিলেন—বাড়িতে করতে দেওয়া লেখাপড়ার কাজ সবাই ঠিক ঠিক করে এসেছে কি না। তারপর শুরু করলেন পড়াতে। ওহ্, সত্যি উনি কত কিছুই যে জানেন! খুবই চালাক-চতুর মহিলা আমাদের এই রিগেল দিদিমণি। পড়াতে শুরু করলেন মাছ দিয়ে, আর শেষ করলেন একেবারে সেই বল্গা-হরিণে এসে। মারগটের মতে—মিস রিগেলের প্রিয় বিষয় হচ্ছে 'বংশবিস্তার'। কথাটা নেহাৎ ভুল বলে না মারগট্। মিস রিগেলের বয়স হয়েছে, কিন্তু তিনি এখনও কুমারী, কাজেই····

পড়াতে পড়াতে থমকে গেলেন উনি। একটা কাগজের গুটলি উড়ে এসে পড়লো আমার ডেস্কে।

'অ্যাঁ, কী ওটা'? ওনার উচ্চারণ থেকে বোঝা যায় যে উনি আদতে হেগ্-এর বাসিন্দা।[১]

---

১ অ্যান্-এর গল্পগুলোর পটভূমি হচ্ছে আমস্টার্ডাম। আমস্টার্ডাম শহরের বাসিন্দারা হেগ্-সহরে লোকেদের উচ্চারণভঙ্গীকে খেলো বলে মনে করে।—ইংরিজী অনুবাদক।

'জানিনা তো দিদিমণি'।

'উঠে এসো, ঐ কাগজটা নিয়ে আমার কাছে এসো'।

কাগজের গুটলিটা হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলুম ওনার কাছে।

'এখন বলো, কে ছুঁড়েছে এটা'?

'জানি না দিদিমণি। আমি তো এখনও ওটা পড়িই নি'।

'অ্যাঁ! বেশ, তাহলে পড়েই দেখা যাক'।

কাগজের গুটলিটা খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন উনি। কাগজে লেখা রয়েছে একটাই মাত্র শব্দ—'বিশ্বাসঘাতক'। লজ্জায় লাল হয়ে উঠলুম আমি। মিসেস রিগেল আমার দিকে তাকালেন।

'এবার বলো তো, কে ছুঁড়েছে এটা'?

'জানি না দিদিমণি'।

'তুমি মিছে কথা বলছো'।

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আমার, কটমট করে তাকাচ্ছিলুম ওনার দিকে। যদিও জানি চোখ দুটো আমার রাগে দুঃখে লাল হয়ে উঠেছে, তবুও মুখে কিছু বললুম না।

এবার সারা ক্লাসকে উদ্দেশ্য করে মিস রিগেল, বললেন 'কে লিখেছো এটা? যেই লিখে থাকো, হাত তোলো'!

ক্লাসের একেবারে পেছন দিকে একটা হাত ওপরে উঠলো। হুঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই—রব্।

'রব্, এদিকে এসো'।

মিসেস রিগেলের সামনে এগিয়ে এলো রব্।

'কেন লিখেছো এটা'?

রব্ নীরব।

'অ্যান্, তুমি কী জানো, এই কথাটা কেন লিখেছে ও'?

'জানি দিদিমণি'।

'বলো তো শুনি'।

'সে অনেক ব্যাপার। ক্লাসের পরে বললে হয় না' ?

'না, এখনই বলো'।

কাজে কাজেই ব্যাপারটা খুলেই বলতে হলো। সেই ফরাসী ভাষার পরীক্ষা, আমি আর লিস্ কেন টোকাটুকি করে গোল্লা পেয়েছিলুম, আর তারপর কিভাবে গোটা ক্লাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলুম আমরা—সবই বললুম।

'চমৎকার গল্প! তা, রব্, ক্লাস চলাকালীন আনাকে তোমার মতামত জানানোটা কি খুবই জরুরী কাজ বলে মনে হলো তোমার? আর আনা, কাগজটা কে ছুঁড়েছে তুমি সে বিষয়ে কিছুই জানতে না, এটা আমি বিশ্বাস করছি না। যাও, জায়গায় গিয়ে বসো তোমরা'।

খেপে একেবারে টং হয়ে উঠেছিলুম। বাড়িতে ফিরে সবাইকে এই বিচ্ছিরী ঘটনাটার কথা বললুম। কয়েক সপ্তাহ পরে পরীক্ষার ফল বেরোল। দেখলুম, মিস রিগেল আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। অত কম নম্বর আমি পেতেই পারি না। বাপিকে বললুম এ ব্যাপারে মিস রিগেলের সঙ্গে একবার কথা বলতে। কিন্তু তাতেও কিছু সুবিধে হলো না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন বাপি। ভদ্রমহিলা আমার নম্বর বাড়াতে মোটেই রাজি হননি। তবে বাপি বললেন যে ওনার সঙ্গে কথা বলার সময় ভুল করে সারাক্ষণই ওনাকে মিস রিগ্‌গল্ বলে ডেকেছেন। আর ভদ্রমহিলা নাকি বাপিকে এ-ও বলেছেন যে আনা ফ্রাঙ্ক খুবই চমৎকার মিষ্টি মেয়ে, আর সে কখনো তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বলেছে—এমন কোন ঘটনা তিনি মনেই করতে পারছেন না।

জ্যামিতির ক্লাশে

১২ই আগস্ট, ১৯৪৩

ক্লাশঘরের সামনেটায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান এক বৃদ্ধ। মাথার মাঝখানটায় চকচকে টাক, তার চারপাশটা ঘিরে রয়েছে থোকা থোকা ধূসর কেশ। রোজ একই পোশাক পরেন, পুরনো ফ্যাশনের উঁচু কলার লাগানো একটা ছাই-রঙা স্যুট, কলারটার ডগা-দুটো ঝুলে থাকে সামনের দিকে। উচ্চারণের ধরণটা তাঁর একটু অদ্ভুত। কখনও আপন মনে বিড় বিড় করে বকেন, আবার কখনও মাঝে মাঝে আনমনে হাসেন। যারা পড়া করার চেষ্টা করে, তাদের ওপরে খুবই সদয় তিনি। কিন্তু ফাঁকি দেয় যারা, দারুণ খাপ্পা তাদের ওপরে।

মোট দশজনকে পড়া ধরলেন আজ। তার মধ্যে ন'জনই উত্তর দিতে গিয়ে গড়বড় করে ফেলল। মূল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্যে আর সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য মেলাই বক বক করলেন তিনি। তিনি ব্যাপারটা এমনভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই উত্তরটা খুঁজে বার করতে পারে। ধাঁধাঁ তাঁর খুব প্রিয় আমাদের প্রায়ই ধাঁধাঁ ধরেন তিনি। আর ক্লাশ শেষ হয়ে গেলে গপ্পো করতে বসেন। কী গপ্পো? যখন তিনি নামকরা এক বিরাট ফুটবল ক্লাবের সভাপতি ছিলেন, তখন কী কী ঘটেছিল, কেমন ছিল সেই দিনগুলো—এইসব।

আমার সঙ্গে কিন্তু মিজ্‌হ্যার হেসিং-এর সারাক্ষণ লেগেই থাকত। তা বলতে নেই, আমার এই বকুন্‌তুড়ে স্বভাবের জন্যেই কোঁদলটা বাধতো। তিনটে পড়া দিতে গিয়ে আমি ছ'বার বকুনি খেয়েছিলুম। আর সহ্য হচ্ছিল না মাষ্টারমশায়ের, দাওয়াই হিসেবে আমাকে ছ'পাতার একটা

রচনা লিখতে দিলেন তিনি। পরের ক্লাশেই রচনাটা ওঁর হাতে দিয়ে দিলুম। মিজ্‌স্থার হেসিং-এর রসবোধটা কিন্তু ভালই ছিল। লেখাটা পড়তে পড়তে হেসে উঠলেন উনি। বিশেষ করে নিচের এই অনুচ্ছেদটা পড়ার সময় উনি খুবই মজা পাচ্ছিলেন:

'এই বকবকানির অভ্যেসটাকে তাড়ানোর জন্যে আমি নিশ্চয় আপ্রাণ চেষ্টা করব। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে কি? স্বভাবটা যে আমার রক্তে মিশে আছে। বকবক করতে আমার মা-ও খুব ভালবাসেন। তাঁর কাছ থেকেই স্বভাবটা বর্তেছে আমার ওপর। চেষ্টা করেও মা কিন্তু নিজের বকুনতুড়ে স্বভাবটা পাল্টাতে পারেন নি'।

আমার রচনাটার নাম ছিল—'বকন্‌দার'।

কিন্তু পরের দিনের পড়ার সময়ও আমার স্বভাব পালটালো না। পাশের মেয়েটার সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করলুম খানিক। নিজের ছোট্ট নোটবুকটা বার করে মিজ্‌স্থার হেসিং লিখলেন—'মিস আনা ফ্রাঙ্ক: "অসংশোধনীয় বকন্‌দার" শীর্ষক একটা রচনা লেখো'।

তা, লিখলুম। মিজ্‌স্থার হেসিং-এর পরের বক্তৃতার সময়ও আমি ফিস্‌ফাস করলুম। ছোট্ট নোটবুকে মাষ্টারমশাই এবার লিখলেন: 'মিস আনা ফ্রাঙ্ক—"শ্রীমতী প্যাঁক পেঁকি বুড়ী প্যাঁক প্যাঁক করছেন" শীর্ষক দু'পাতার একটা রচনা লেখো'।

আমার জায়গায় থাকলে তোমরা কী করতে? বেশ বুঝতে পারছিলুম যে মাষ্টারমশাই আমাকে নিয়ে মজা করছেন, নাহলে তো উনি আমাকে জ্যামিতির খানকয়েক কড়া কড়া পড়া ধরিয়ে দিলেই পারতেন! ঠিক করলুম, মজার জবাব মজা দিয়েই দেওয়া যাক। স্যানি হাউট্‌মান্‌-এর সাহায্য নিয়ে গোটা রচনাটা পদ্যে লিখে ফেললুম। পদ্যটার খানিকটা তুলে দিচ্ছি এখানে:

'প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক'—শ্রীমতী প্যাঁকপেঁকি
ডাকলেন ছানাদের। মায়ের ডাকে
এ ওকে ঠেলে, হুড়মুড়িয়ে—

থপ্‌থপিয়ে ছুটলো ছানার দল
ডাকছে যে মা, চল্‌রে ছুটে চল্‌।
'মা, মাগো মা, একটু রুটি দাও,
জ্বলছে যে পেট, দেখছো না কি তা-ও'?
আহা, খিদের জ্বালায় ধুঁকছে বেচারারা।
মা বললেন, 'এই তো বাছা, খাবার এনেছি,
এইগুলো খাও, আবার পাবে, জমিয়ে রেখেছি।
আনতে খাবার গিয়েছিলুম নদীর ওপারেতে,
সহজ তো নয়, তবুও জানি, হবেই আমায় যেতে।
চুরি করেই আনতে হলো, থাকগে সে-সব কথা,
যে যার খাবার গুছিয়ে নিয়ে, বোসো যথা-তথা।
ছোট্ট ছানারা বড্ডো চালাক
মায়ের কথা শুনলো বেবাক।
খেতে গিয়ে বাধলো বেজায় গোল
'প্যাঁক্‌-প্যাঁক্‌-প্যাঁক', 'কোয়াক্‌-কোয়াক', বিষম ডামাডোল।
ব্যাপ্‌রে ওরে, ঝাপ্‌টে ডানা আসছে ছুটে—কে সে?
ক্ষিপ্ত রাজহাঁস! হা ভগবান, বাঁচাও হেথায় এসে!
—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জোরে জোরে পড়ে কবিতাটা সারা ক্লাশকে শোনালেন হেসিং, অন্য ক্লাশের ছেলে-মেয়েদেরও শোনালেন ডেকে ডেকে। তারপর লেখাটা ফেরৎ দিলেন আমাকে। এই ঘটনার পর থেকে আমাদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল। আমার বক্‌বকানি নিয়ে উনি আর মাথা ঘামাতেন না, আর কোনদিন শাস্তিও দেন নি আমাকে।

পুনশ্চ: এক কথায় বললে, আমাদের অঙ্কের শিক্ষকটি ছিলেন চমৎকার মানুষ। এরপর থেকে অনেকেই আমাকে 'শ্রীমতি 'প্যাঁকপেঁকি বুড়ী' বলে ডাকত। তার জন্য আমি মিজ্‌স্টার হেসিং-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

পেইং গেষ্ট

১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩

বাড়ির পিছন দিকের পেল্লায় শোবার-ঘরটা ভাড়া দিতে বাধ্য হলুম আমরা। আমাদের সব অহঙ্কার-টহঙ্কার যেন একেবারে ধুলোয় মিশে গেল। বাইরের লোকের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকার অভ্যেস এর আগে আমাদের ছিল না। ঘরটা সাফ-সুতরো করে, আমাদের কুড়োনো-বাড়ানো জিনিসপত্র দিয়ে সেটাকে যতটা পারা যায় সাজানো হল। কিন্তু ও-সব দিয়ে সাজালে কি আর শোবার-ঘর খোল্‌তাই হয়? কাজে কাজেই নতুন কিছু জিনিসপত্র আনতে হল।

হপ্তা তিনেকের মধ্যেই বাজে কাগজ ফেলার একটা চেক্‌নাই ঝুড়ি আর একখানা চায়ের টেবিল এসে গেলো আমাদের ঘরে। জিনিস দুটো সত্যিই পছন্দসই। কিন্তু তা বললে কী হবে। একটা চমক-লাগানো দেরাজ আর খান দুই আরামকেদারা না হলে যে চলবে না।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে, বেরিয়ে পড়লেন বাপি। নিলাম-ঘরে গিয়ে একটা কেঠো বেঞ্চিতে বসলুম আমরা। আগে থেকেই বেঞ্চিটায় মুশ্‌কো একদল লোক বসে ছিল গাদাগাদি করে। তা, আমরাও বসেই রইলুম, ঠায় বসে রইলুম···। কিন্তু বসে বসে হাপু গুণে কিস্যুই হল না। সেদিন বিকেলে ওরা শুধু গোটাকতক চীনামাটির জিনিস বেচলো।

মুখ আম্‌সি করে ফিরে এলুম আমরা। পরের দিন ফের যাওয়া হল। নাহ্, বরাতটা সেদিন নেহাত মন্দ ছিল না। একখানা বেশ চোখ-ধরা ওক্‌কাঠের দেরাজ, আর চামড়ায়-মোড়া একজোড়া আরামকেদারা খরিদ করলেন বাপি।

খুশির চোটে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লুম আমরা। এক কাপ করে চা আর একটা করে পেস্ট্রী মজা করে খেলুম দুজনে। খেয়ে-দেয়ে ঘরে ফেরা গেলো।

কিন্তু জিনিসগুলো ঘরে আনতেই একগাল মাছি। দেরাজটার গায়ে কী-সব দাগ রয়েছে। মা-মণি ঠিক দেখে ফেললো। বাপিও তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো দেরাজটা। ও মা, কাঠে যে উই একেবারে থিকথিক করছে গো। নিলামওয়ালারা এ-সব ব্যাপার কক্ষনো জানায় না। আর কেনা-বেচার ঘরখানা যা অন্ধকার, দেখাই যায় না কিছু।

আরামকেদারা দুটোকেও যাচিয়ে দেখতে হল। হুঁ, যা ভাবা গেছে তাই। এ দুটোতেও উইপোকার রাজত্যি।

নিলাম-ঘরে ফোন করে জিনিসগুলো এই দণ্ডে ফেরৎ নিয়ে যাবার জন্য বলা হল। ফোন-টোন করার পর, মা-মণি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। নিশ্বাস একটা বাপিও ফেললো, তবে সেটা স্বস্তির নয়। নিলাম-ঘরের লোকেরা ফোনে জানিয়েছিল—জিনিসগুলো ওরা নিয়ে যাবে বটে, কিন্তু টাকা-কড়ি কিছু ফেরত দেবে না।

দিনকতক পরে একটা যা-হোক গতি হল ব্যাপারটার। বাপির এক বন্ধুর কিছু আসবাবপত্তোর ছিল। তিনি আমাদের তার থেকে কিছু ধার দিতে রাজি হলেন। শেষতক্ ব্যাপারটার হিল্লে হল তাহলে!

(হায় রে বরাত, এখন লিখি যে কী করে? নাহ্, সত্যি আমি একখান্ মেয়ে বটে। কলমটা যে পড়ে গেলো স্টোভের মধ্যে। পুরনো একখানা ত্যাড়া-বাঁকা কলম দিয়েই আপাতত কাজ চালাই)।

তখন সবাই মিলে পরামর্শ করতে বসলুম। মোড়ের ঐ বইয়ের দোকানটায় একটা ছোটমতন পোস্টার টাঙাতে হবে। মানে, পরের হপ্তায় আমরা ঘরটা ভাড়া দেবো, তারই বিজ্ঞাপন আর কি।

তা, জনাকতক লোক এলো ঘরটা দেখতে। প্রথমে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর অবিবাহিত ছেলের জন্যে ঘরটা দরকার। সেই

ছেলেকেও সঙ্গে এসেছিল। কথাবার্তা প্রায় পাকা, এমন সময় ছেলেটা গোটাকতক কথা বলে বসলো। উদ্ভট সব অগোছালো কথা। শুনে-টুনে মা-মণি তো বেঁকে বসলেন—ছেলেটা পাগল-টাগল নয় তো। নেহাত ভুল ভাবেন নি মা-মণি। কারণ বৃদ্ধ খুব দুঃখের সঙ্গে জানালেন তাঁর ছেলেটা মাঝে-মধ্যে একটু 'ভুল-ভাল' বকে বটে।

বিস্তর কায়দা করে দুজনকে বাড়ি থেকে হঠালেন মা-মণি। তারপর একে একে ডজনখানেক লোক এলো আর গেলো। শেষমেশ এলেন এক তাগড়া চেহারার মাঝবয়সী ভদ্রলোক। ঘরটার জন্যে তিনি বেশ ভালো টাকাই দিতে চাইলেন, তাঁর বেশ দরকারও আছে মনে হল। এই ভদ্রলোককেই ঘরটা ভাড়া দিলুম আমরা।

খুব মজাদার মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক। প্রতি রবিবার তিনি আমাদের জন্যে চকোলেট নিয়ে আসতেন, আর বড়দের জন্যে আনতেন সিগারেট। বার কয়েক তো আমাদের সবাইকে সিনেমাতেও নিয়ে গেছলেন। আমাদের বাড়িতে দেড় বছর রইলেন ভদ্রলোক। তারপর মা, বোন আর নিজের জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে গেলেন। পরে তিনি বলেছিলেন যে আমাদের সঙ্গে থাকার দিনগুলো নাকি খুব সুন্দর কেটেছিল তাঁর।

বইয়ের দোকানে আরেকটা বিজ্ঞাপন টাঙানো হল। আবার সব লম্বা-বেঁটে, বুড়ো-খুবোর আমদানী শুরু হল বাড়িতে। মিস্ জেল নামে এক যুবতী মহিলা এলেন, মাথায় তাঁর থলের মত একখানা শিরাবরণ। দেখামাত্রই আমরা তাঁর নামকরন করলুম 'মোক্ষদা নেল্'। ঘরটা তাঁকেই ভাড়া দেওয়া হল। কিন্তু এঁকে সেই মোটা ভদ্রলোকের মত চমৎকার মানুষ বলে মনে হল না আমাদের।

পয়লা নম্বর কথা হল—ভদ্রমহিলা বড় অগোছালো, ঘরটাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে রাখতেন। দোসরা নম্বরটা আরও খারাপ, —ভদ্রমহিলার এক প্রেমিক ছিল, সে মাঝে মাঝে মাতাল অবস্থায় এসে হাজির হত। যেমন একদিন প্রায় মাঝ-রাত্তিরে বাড়ির ঘ

২

বেজে উঠলো ক্রঁ-ক্রঁ করে। বাপি গিয়ে দরজা খুললেন। দরজার দাঁড়িয়ে ছিল সেই লোকটা, মদে একেবারে চুরচুর। বাপির কাঁধে চাপড় মেরে লোকটা বারবার বলতে লাগল, 'আমরা তো খুব ভালো দোস্ত, কি বলেন?'

'হাঁ, ঠিক, আমরা দুই খাসা দোস্ত, হাঁ'! লোকটার মুখের ওপর দড়াম্ করে দোরটা বন্ধ করে দিয়েছিল বাপি।

১৯৪০ সালের মে মাসে ওরা (জার্মান নাৎসী বাহিনী) হল্যাণ্ড আক্রমন করলো। তখন আমরা মোক্দা নেল্-কে বললুম ঘরটা খালি করে দিতে। ঐ ঘরে আমাদের পরিচিত একজনের থাকার ব্যবস্থা করা হল। এর বয়স ছিলো বছর তিরিশেক। লোকটা মন্দ ছিল না। দোষ বলতে একটাই—অতিরিক্ত আদর পেয়ে পেয়ে সে একেবারে ফুলবাবু হয়ে পড়েছিল। একটা ঘটনা বলি। তখন জব্বর শীত। যতোটা পারছি বিদ্যুৎ বাঁচাচ্ছি আমরা সবাই। আর লোকটা কিনা ঠাণ্ডা নিয়ে নালিশ করতে শুরু করলো। কথাটা মোটেই সত্যি ছিলো না। ওর ঘরের অগ্নিকুণ্ডটা একেবারে গন্‌গনে হয়েই জ্বলতো।

কী আর করা। ভাড়াটেদের আবদার তো একটু-আদটু মানতেই হয়। বৈদ্যুতিক স্টোভ ব্যবহার করার অনুমতি ওকে দেওয়া হল। ফলং? দিনভোর স্টোভটা জ্বালাতে লাগলো ও। আমরা ওকে একটু সামলে-সুমলে চলতে বললুম। ইলেক্ট্রিক বিলের টাকা চড়চড় করে বেড়ে গেলো। একদিন সকালে মা-মনি আর থাকতে পারলো না। রেগে-মেগে বিদ্যুতের লাইনটা বন্ধ করে দিলো। ব্যস, সারাদিন বিদ্যুৎ লো-পাত্তা। শেষমেষ সবাই মিলে ঐ বৈদ্যুতিক স্টোভের ঘাড়েই দোষটা চাপালো, 'অ্যায়, ঐ স্টোভটা এত বেশি জ্বলেছে বলেই লাইনটা পুড়ে গেছে'। লোকটা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমাদের বাড়িতে দেড় বছর থাকার পর সে বিয়ে করে চলে গেল।

আবার ঘর ফাঁকা। বিজ্ঞাপনটা টাঙানোর তোড়জোড় করছিলেন মা-মনি। এইসময় মা-মনির এক বন্ধু জানালেন—বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে

যাওয়া এক ভদ্রলোকের একখানা ঘরের খুব দরকার। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক হবে, লম্বা চেহারা, চোখে চশমা, আর মুখখানায় কোন দরদ-টরদের বালাই নেই। বন্ধুর কথা ফেলতে পারলো না মা-মনি। ভদ্রলোক চলে এলেন আমাদের বাড়িতে। এনারও এক প্রেমিকা ছিল। মেয়েটি হামেশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। বিয়ের দিন-ক্ষনও প্রায় ঠিক হয়ে গেছলো। হঠাৎ একদিন দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেলো। ভদ্রলোক দুম্ করে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেন।

এর দিনকতক পরে আমাদেরকেই ওখান থেকে চলে আসতে হল। খুব শিক্ষা হয়েছে, আর আমরা বাড়িতে কখনো পেইং গেস্ট রাখতে চাই না বাবা, রক্ষে করো।

চলচ্চিত্রাভিনেত্রী হওয়ার রুপোলী স্বপ্ন

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩

এক সপ্তদশী সুরূপা কন্যা আমি। আঁখিপল্লবে প্রণয়ের ঝিলিক, মাথা-ভরা কুঞ্চিত কেশরাজি। কিশোরী-মনে নানান আদর্শ, মোহ আর দিবাস্বপ্নের দোলাচল। চোখের মণিতে স্থির বিশ্বাস—একদিন না একদিন আমার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে, ধূসর আঁখিযুক্ত চলচ্চিত্র রসিকদের স্মৃতির মহাফেজখানায় অক্ষয় অমলিন হয়ে থাকবে আমার ছবি।

কিভাবে অর্জন করবো এই খ্যাতি, কোন্ পথে এগোবো—এ সব প্রশ্ন তখন অবান্তর। চৌদ্দ বছর বয়সে ভাবতুম, 'সময় এলেই স-ব হবে।' সতেরো বছর বয়সেও সে ভাবনার কোন বদল ঘটেনি। আমার এইসব আজব পরিকল্পনার কথা মামণি-বাপি কিছুই জানতো না। আমিও জানতে দিতুম না, মগজের মধ্যে ঠেসে রাখতুম ওদের। মনে মনে ভাবতুম—যদি কখনো বিখ্যাত হয়ে পড়ি, তাহলে তার প্রথম স্বাদটুকু একা একাই উপভোগ করব, তারপর জানাবো মামণি আর বাপিকে। আসলে, ওনারা আমার ঐসব উদ্ভট ভাবনায় খুব একটা উৎসাহ যোগাবেন বলে আমার মনে হত না।

এ-সব বলছি বলে যেন ভেবে বসবেন না যে ঐসব আকাশকুসুম কল্পনাকে আমি নিজে খুব গুরুত্ব দিতুম বা খুব সত্যি বলে ভেবে নিয়েছিলুম, কিম্বা ওগুলো ছাড়া আর কিছুই আমার মাথায় ছিলো না। না, মোটেও তা নয়। বরং ইস্কুলে আমি খুব খেটে-খুটে পড়াশোনা

করতুম, আর পড়তে আমার বেশ ভালোও লাগতো। পনের বছর বয়সে আমাদের ঐ ত্রি-বার্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর প্রথমটায় আমি পাশ করে যাই। তারপর থেকে সকালে যাই শুধু বিদেশী ভাষা শেখার ইস্কুলে, আর বিকেলে হোম্‌টাস্ক করি কিম্বা টেনিস খেলি। এর মাঝে একদিন (সেটা শরৎকাল) বাড়ির দেরাজটা ঝাড়-পোঁছ করছিলুম আমি। একরাশ হাবিজাবি জিনিসের মধ্যে একটা জুতোর বাক্স পড়েছিলো। বাক্সটার ঢাকনায় বড় বড় হরফে লেখা 'চিত্র তারকারা'। মনে পড়লো, মা-মণি আর বাপি এই বাক্সটা বাইরে ফেলে দিতে বলেছিলো। আমি ফেলিনি। যাতে কেউ দেখতে না পায় এমন জায়গায় লুকিয়ে তুলে রেখে দিয়েছিলুম।

খুব আগ্রহভরে খুলে ফেললুম ঢাকনাটা। ভেতরে ছোট ছোট হরেকরকম আকারের মোড়ক। বার করলুম সেগুলো। ইলাস্টিক ব্যাণ্ডের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে মোড়কগুলো খুলে ফেললাম। হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম রঙ-চঙে মুখগুলোর দিকে। একেবারে বুঁদ হয়ে গেছলুম। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো, হটাৎ কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখলো। চমকে উঠলুম। ও, চা খাবার জন্মে ডাকতে এসেছে। মেঝের ওপর থেব্‌ড়ে বসেছিলুম, চারপাশে খবরের কাগজ আর পত্র-পত্রিকা থেকে কাটা ছবির ডাঁই।

ঘরটা সাফ-সুতরো করার সময় জুতোর বাক্সটাকে সরিয়ে রাখলুম এক পাশে। সন্ধ্যেবেলায় ফের বসলুম বাক্সটা নিয়ে। আর তখন একটা দারুণ জিনিস চোখে পড়লো, জিনিসটা আমাকে মোহিত করে ফেললো, কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না সেটাকে।

জিনিসটা একটা খাম। খাম ভর্তি একটা অভিনেত্রী পরিবারের ছবি। পরিবারের তিনটি মেয়েই চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী। ঠিকানাটাও পাওয়া গেলো। ওদের পদবী হচ্ছে লেন। তৎক্ষণাৎ এক টুকরো কাগজ আর কলম নিয়ে ওদের ছোট বোন প্রিসিলা লেন-এর কাছে একটা চিঠি লিখতে বসে গেলুম।

ইংরিজিতে লেখা ঐ চিঠিটা গোপনে ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে এলুম। প্রিসিলাকে চিঠিতে লিখেছিলুম যে ওর এবং ওর আর দুই বোনের ছবি পেলে আমি খুব খুশি হবো, আর ও যেন আমার চিঠিটার উত্তর দেয়, ওদের পরিবারের কথা জানতে আমি খুবই উৎসুক।

ছ মাস গড়িয়ে গেলো। উত্তর পাওয়ার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম, যদিও তা নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইতুম না। তাছাড়া, উত্তর না পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? সমস্ত ভক্তের চিঠির উত্তর দিতে হলে আর তাদের প্রত্যেককে নিজেদের ছবি পাঠাতে হলে লেন ভগ্নীদের সারাটা দিন তো মনে হয় শুধু ঐ কাজেই কেটে যাবে! কিন্তু ঠিক তখনই···ঠিক তখনই একদিন সকালে বাপি আমার হাতে একখানা চিঠি তুলে দিলেন। চিঠিটার ওপরে লেখা 'মিস আনা ফ্রাঙ্কলিন'।

চিঠিটা তড়ি-ঘড়ি খুলে, পড়ে ফেললুম এক নিশ্বাসে। বাড়ির সবাই তো মুখিয়ে আছে—কার চিঠি? আমার চিঠি পাঠানোর কথাটা বলে, প্রিসিলার চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে শোনালুম সবাইকে। ও লিখেছে যে, আমি নিজের কথা আরও বেশি করে লিখে না জানালে আমাকে ওর ছবি পাঠাবে না। আর আমি যদি নিজের কথা আর আমাদের বাড়ির সবাইকার কথা বিশদ ভাবে লিখে ওকে জানাই, তাহলে ও চটপট ওর ছবি পাঠিয়ে দেবে।

তো, আমি ওকে সত্যি কথাটাই লিখলুম। বললুম—ওর অভিনেত্রী জীবন সম্বন্ধে আমার তেমন কৌতূহল নেই, আমি ওর ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতে চাই। জানতে চাই, সন্ধ্যেবেলায় ও বেড়াতে বেরোয় কি না, রোজমেরীকেও ওর মতন কঠিন পরিশ্রম করতে হয় কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ কিছুদিন পরে ও আমাকে জানালো, আমি যেন ওকে ওর ডাক নাম ধরেই ডাকি। ওর ডাক নাম হচ্ছে 'প্যাট'। এতো খুশি হয়েছিলো যে অতি ব্যস্ততার মধ্যেও মনে করে আমার প্রত্যেকটা চিঠির জবাব দিতো প্রিসিলা।

আমাদের মধ্যে ইংরিজীতেই চিঠিপত্তোর চালা-চালি হত। ফলে, বাপি-মামণি টুঁ শব্দটিও করতে পারতো না। কেননা, এইসব চিঠি-চাপাটি করতে গিয়ে আমার ইংরিজীর চর্চাটা যে দিব্যি চলছিলো। প্রিসিলা জানিয়েছে, ওর বেশির ভাগ সময়টাই কেটে যায় স্টুডিওতে। অন্ত অন্ত সময় কী করে না করে, তা-ও খুঁটিয়ে জানিয়েছিল ও। আমার চিঠির ইংরিজীর ভুল-টুলগুলো শুধরে, আমার কাছে সেগুলো পাঠিয়ে দিতো ও। কিন্তু সেই সঙ্গেই বলে দিতো—চিঠিগুলো আবার ফিরিয়ে দিতে হবে ওকে। ও হ্যাঁ, এর মধ্যে ওদের একরাশ ছবিও পাঠিয়েছিল।

প্রিসিলার বয়স তখন কুড়ি। তখনও পর্যন্ত ও কাউকে বিয়েও করে নি, কিম্বা প্রেমে-ট্রেমেও পড়ে নি। অবশ্য ও-সব নিয়ে আমি মাথাও ঘামাতুম না। আমার অভিনেত্রী বান্ধবীটির জন্যে গর্বে তখন আমার মাটিতে পা পড়ে না।

ফুরিয়ে গেলো শীতের প্রহর। বসন্তের শেষদিকে চিঠি এলো প্রিসিলার। যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে আমাকে আমেরিকায় গিয়ে গ্রীষ্মের দুটো মাস ওদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ফুর্তির চোটে লাফিয়ে উঠলুম তড়াক্ করে। কিন্তু, মামণি-বাপি? দুজনেরই প্রবল আপত্তি। কী, না—আমি একা একা অতদূরে আমেরিকায় যাবো কী করে? আমার তেমন পোষাক-পরিচ্ছদ কই? এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ঠিক হবে না, সবাইকে ছেড়ে অতোদিন আমি থাকতেই পারবো না, হ্যান্ ত্যান্—মানে, সব স্নেহপ্রবণ বাবা-মা-ই যেমনটা বলে থাকে আর কি। কিন্তু আমি মনে মনে তৈরী—আমেরিকায় আমাকে যেতেই হবে।

তা, সব খুলে জানালুম প্রিসিলাকে মায় বাবামায়ের ওজর আপত্তি শুদ্ধ। ও আমার সবকটা সমস্যারই সুন্দর সমাধান করে দিলো। প্রথমত, আমাকে একা যেতে একা হবে না। প্রিসিলার এক বন্ধু তখন

হেগ্-এ তার আত্মীয়দের কাছে বেড়াতে এসেছিল। তার সঙ্গে আমি আমেরিকায় যেতে পারবো। আর ওখান থেকে হল্যাণ্ডে ফেরার সময় আমার সঙ্গে কাউকে দিয়ে পাঠানোর বন্দোবস্তও প্রিসিলাই করে দেবে।

কিন্তু বাপি-মামণি তবুও গররাজি। ওঁদের যুক্তি হল—আমরা কেউই লেন পরিবারের কারুকে তেমন চিনি না আর আমিও বাড়ির বাইরে কখনো থাকিনি, কাজেই ওখানে গিয়ে আমি মোটেই স্বস্তি অনুভব করব না। ওহ্, কী ঝামেলা! আমার সুযোগটা হাতছাড়া না করাতে পারলে যেন ওঁদের শান্তি নেই। অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলুম—এরকম আন্তরিক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে ওঁদেরকে অপমান করা হবে। তারপর ওখান থেকে প্রিসিলার মা মিসেস লেন একটা সুন্দর চিঠি পাঠালেন বাপি-মামণির কাছে। ঐ চিঠিটা পড়ে আশ্বস্ত হলেন ওঁরা, আমাকে যেতে দিতে রাজি হলেন অবশেষে। মে জুন দুটো মাস খুব খাটলুম। এই সময় একদিন প্রিসিলার চিঠি এলো। লিখেছে—ওর বান্ধবী আমস্টারডামে এসে পৌঁছবে আঠারোই জুলাই। ততদিনে আমার যাওয়ার সব তোড়-জোড় সারা হয়ে গেছে।

আঠারো তারিখে আমি আর বাপি স্টেশনে গেলুম সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ওনার একটা ছবি প্রিসিলা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফলে, ভীড়ের মধ্যেও ওঁকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না আমার। ভদ্রমহিলার নাম মিস হ্যাল্‌উড, ছোটখাটো চেহারা, মাথাভরা সোনালী চুল, তাতে একটু একটু ধূসর আভা। খুব বকবক করেন, একেবারে তড়বড় করে বকে চলেন। বেশ মিষ্টি চেহারা।

বাপি কিছুদিন আমেরিকায় ছিলেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে ইংরিজীতে কথা বলতে শুরু করে দিলেন বাপি। আমিও ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে কথা বললুম। আমাদের বাড়িতে থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন

বাবা। উনি রাজী হলেন, আমাদের সঙ্গে এক সপ্তাহ থেকে গেলেন মিস হ্যাল্‌উড। প্রথম দিনই ওনার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমে গেল। কোথা দিয়ে যে কেটে গেলো সাতটা দিন।

পঁচিশে জুলাই এসে পড়লো। ওহ্, সে কী উত্তেজনা! প্রাতরাশের সময় তো কিছু মুখেই দিতে পারলুম না। কিন্তু নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে মিস হ্যাল্‌উড একেবারে পোক্ত পর্যটক হয়ে গিয়েছিলেন। ওনার মধ্যে কোনরকম উত্তেজনার চিহ্নও ছিল না। শিপোল্‌ বিমানবন্দরে আমাদের বিদায় জানানোর জন্য বাড়ির সকলে গিয়ে হাজির। হঁ্যা অবশেষে···অবশেষে শুরু হল আমার আমেরিকা যাত্রা!

পঞ্চম দিন গিয়ে পৌঁছলুম হলিউডের কাছে। প্রিসিলা আর ওর দিদি রোজমেরী (যে ওর থেকে এক বছরের বড়) আমাকে নিতে এল। তখন আমি বেশ ক্লান্ত। তাই সেদিন আর বাড়ি না গিয়ে আমরা বিমান বন্দরের কাছেই একটা হোটেলে উঠলুম। পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেয়ে, মোটরে ওঠা হল। গাড়ি চালাচ্ছিল রোজমেরী।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলুম লেন্‌দের বাড়িতে। ওঁরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

মিসেস লেন আমাকে আমার ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। ভারি চমৎকার ঘর, সামনে একটা বারান্দা। আগামী ছ'মাসের জন্যে এইটাই তাহলে আমার আস্তানা!

লেনদের আদর-যত্নের মধ্যে সত্যি আমার কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। সারাদিনে এরা অনেক কাজ আর মজা করে। আমি তো নিতান্ত একটা সাধারণ মেয়ে। আমি আমার মা-কে ঘরের কাজকর্মে যতটা সাহায্য করি, এরা তিন বিখ্যাত অভিনেত্রী বোন কিন্তু তাদের মা-কে তার থেকে অনেক বেশিই সাহায্য করে। এখানে এসে ইংরিজী বলাটা

বেশ তাড়াতাড়িই রপ্ত হয়ে গেল। আমার ওখানে থাকার প্রথম দুটো সপ্তাহ স্টুডিওতে প্রিসিলার কোন কাজ-টাজ ছিল না, ও আমাকে অনেক কিছু চমৎকার দ্রষ্টব্য ঘুরিয়ে দেখাল। প্রত্যেকদিনই আমরা সমুদ্র তীরে বেড়াতে যেতুম, এমন অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেল, যাদের কথা আমি আগে শুনেছি বা পড়েছি। মেজ্ বেলামি প্রিসিলার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চারপাশ দেখে বেড়ানোর সময় ও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থাকতে।

প্রিসিলা যে আমার থেকে বড়, তা কেউ বুঝতেই পারত না। ও আমার সঙ্গে ঠিক সমবয়সী বন্ধুর মতই মেলামেশা করত। পনেরো দিনের ছুটি শেষ হতে ও আবার ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওয় যেতে শুরু করল। আহ্, কী মজা—আমিও ওর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেলুম। সাজ-ঘরে যেয়ে দেখি ও সাজগোজ করছে।

সেদিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ও আমাকে স্টুডিওটা ঘুরে-ফিরে দেখালো। তারপর বলল, 'বুঝলে আনা, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। এখানে অনেক দেখতে শুনতে ভালো মেয়েই অফিসে গিয়ে অভিনয়ের ছোটখাটো কাজের জন্যে আবেদন-টাবেদন করে। কাল সকালে তুমিও চলে এসো। তারপর এখানকার অফিসে গিয়ে বলো, তোমাকে দেওয়ার মত কোন কাজ-টাজ আছে কি না যদি থাকে তাহলে করবে। আসলে একটু মজা করার জন্যে, বুঝলে না'!

বললুম, 'সত্যি, হলে দারুণ হয়'।

পরের দিন সত্যি সত্যিই অফিসে চলে গেলুম। কী ভীড়, কী ভীড়! মেয়েরা সব সার বেঁধে মস্ত হল্-এ দাঁড়িয়ে আছে! আমিও দাঁড়িয়ে পড়লুম। আধ ঘন্টার মধ্যেই ঢুকে পড়লুম ভেতরে। তখনও কিন্তু আমার ডাক পড়েনি, আমার সামনে তখনও বিস্তর মেয়ের ভীড়। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলুম। ঘন্টা দুয়েক কেটে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর একটা ঘন্টি বেজে উঠল—আহ্, ডাক পড়েছে। গটমট করে ঢুকে পড়লুম ভেতরের অফিস-ঘরটার মধ্যে। একটা ডেস্কের

পেছনে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে ছিলেন। গুরুগম্ভীর গলায় আমাকে স্বাগত জানালেন ভদ্রলোক, নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন। সুদূর হল্যাণ্ডের মেয়ে আর লেনদের অতিথি শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন উনি। এইসব পুছ্তাই শেষ করে, আমার দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'তুমি তাহলে অভিনেত্রী হতে চাও, তাই তো' ?

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে জানি না পারবো কি না'।

একটা বোতামে চাপ দিলেন ভদ্রলোক। ঘরে ঢুকলো একটি চমৎকার পোষাকপরা সপ্রতিভ মেয়ে। ইঙ্গিতে সে আমাকে তার সঙ্গে যেতে বলল। চললুম পেছু পেছু। একটা দরজার গায়ে চাপ দিল মেয়েটি। খুলে গেল দুয়ার। আর ঘরের তীব্র আলোর রোশনাইয়ে ঝলসে গেল আমার চোখ দুটো। জটিল ধরণের একটা যন্ত্রের পিছনে এক যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। বেশ আন্তরিকভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, একটা উঁচু টুলের ওপর বসতে বলল সে। পটাপট আমার গোটাকতক ছবি তুলে ফেলল যুবকটি। তারপর মেয়েটি এসে আমাকে আবার নিয়ে গেল সেই মাঝবয়সী ভদ্রলোকের কাছে। উনি জানালেন—আমাকে দিয়ে অভিনয়ের কাজ চলবে কি না, জানিয়ে খবর পাঠাবেন।

টগবগে উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলুম লেনদের বাড়িতে। এক সপ্তাহ পরে মিস্টার হ্যারউইকের (ভদ্রলোকের নামটা প্রিসিলাই বলে দিয়েছিল) চিঠি এল। লিখেছেন—আমার ছবিগুলো খুব সুন্দর এসেছে, আগামীকাল বিকাল তিনটের সময় যেন অফিসে যেয়ে দেখা করি।

ব্যস্, আর আমায় পায় কে! চলে গেলুম সটান। টেনিস র‍্যাকেট তৈরীর একটা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের জন্যে কাজ করতে আমি রাজি কি না, জানতে চাইলেন মিস্টার হ্যারউইক্। কাজটা মোটে এক সপ্তাহের, তবে কাজটা মিনি-মাগনা নয়, নগদ নগদ মিলবেও কিছু। আমি তো আহ্লাদে আটখানা। রাজি না হয়ে যাই কোথা!

কোম্পানীর লোককে ফোন করলেন হারউইক্। লোকটির সঙ্গে ঐদিন বিকালেই আমার মোলাকাৎ হল।

পরের দিন যেতে হল ছবি তোলার একটা স্টুডিওতে। পরপর সাতদিনই যেতে হবে চুক্তি অনুযায়ী। মিনিটে মিনিটে পোশাক পাল্টাতে হত। তারপর এই দাঁড়াও রে, এই বোসো রে, হ্যাঁ এবার এদিকে ফেরো, আচ্ছা, পোশাকটা পাল্টে নাও চট করে, মুখে একটু নতুন রঙ লাগাও, এবার হাসো—হাসো! সারা দিনের শেষে শরীরে যেন দুনিয়ার ক্লান্তি ভীড় করে এলো, বিছানায় কোনরকমে নিজেকে নিয়ে ফেলার অপেক্ষা। তৃতীয় দিন তো আমার হাসতেও কষ্ট হচ্ছিল, তবু চুক্তি বজায় রাখার জন্যে জোর করেই হাসি আনতে হচ্ছিল মুখে।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যের সময় ঘরে ফিরলুম। আমাকে তখন বোধহয় খুব অসুস্থ-অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তাই দেখে মিসেস লেন সাফ বলে দিলেন—কাল থেকে তুমি আর ওখানে যাবে না। কোম্পানীতে ফোন করে কথাটা উনিই জানিয়ে দিলেন, আমার হয়ে নানান অজুহাতও দিলেন। কোম্পানী আমাকে মাপ করেছিল।

মনটা ভরে উঠল কৃতজ্ঞতায়। আমেরিকায় থাকার বাকি দিন-গুলো চুটিয়ে উপভোগ করা গেল। ওহ্, সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। আর আমার অভিনেত্রী হওয়ার নেশা চিরতরে দূর হয়ে গেল। বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনটা কেমন, তা যে আমি খুব কাছ থেকে দেখে এসেছি!

আমার প্রথম প্রবন্ধ

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

আমার প্রথম প্রবন্ধ যাকে নিয়ে লেখা, সে যদি জানতে পারত যে আমি তাকে আমার লেখার 'মশলা' বানিয়েছি, তাহলে নির্ঘাৎ লজ্জায় লাল হয়ে বলে উঠত—'সে কি? আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? আমার মধ্যে কোন্ দারুণ ব্যাপারটা পেলে তুমি'? সত্যি কথাটা বলেই ফেলা যাক: আমার প্রথম লেখাটা ছিল পেটারকে নিয়ে। ব্যাপারটা খুলেই বলি তাহলে।

কাউকে নিয়ে কিছু লেখার কথা তখন আমার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু মুস্কিল হল, বাড়ির সবাইকে নিয়েই লিখে ফেলেছি এর আগে। বাকি শুধু পেটার। ঠিক করলুম, ওকে নিয়েই লিখবো। ছেলেটা কখনোই আগ বাড়িয়ে সামনে আসে না, আড়ালে আড়ালেই থাকে—অনেকটা মারগটের মতন আর কি। ঝগড়াঝাঁটিও করে না কখনো।

কোনদিন সন্ধ্যের ঝোঁকে যদি ওর ঘরের দোরটা ঠ্যালো, তাহলে শুনতে পাবে ভেতর থেকে নরম গলায় ও বলছে, 'ভেতরে এসো'। ভেতরে ঢুকলে কী দেখবে জানো? দেখবে, চিলকোঠার মইয়ের ছুটো ধাপের মাঝ দিয়ে ও তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর মিষ্টি গলায় বলছে, 'ও, তুমি'!

ওর সেই ছোট্ট ঘরটা—আচ্ছা, ওটাকে কি আদৌ ঘর বলা চলে? আসলে ওটা একটা ফালি মতন জায়গা। সরু একরত্তি একটা ফালি। তবে ও কিন্তু ঐটাকেই দিব্যি একটা ঘর বানিয়ে ফেলেছে। মইটার বাঁ-দিকে যখন ও বসে, তখন ওর আর দেয়ালটার মধ্যে ফাঁক-

থাকে বড় জোর হাত তিনেক। পাশেই ওর চেয়ার আর টেবিল। টেবিলটা আমাদেরই মত বই-পত্তোরে ঠাসা (মইয়ের কয়েকটা ধাপিতেও ওর বই পত্তোর রাখা থাকে)।

মইয়ের উল্টোদিকে ঘরের ছাদ থেকে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে ওর সাইকেলটা। ওই যন্তোরটাকে এখন আর ব্যবহার করা হয় না। বাদামী কাগজ দিয়ে যত্ন করে মুড়ে-টুড়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে প্যাডেল থেকে বেরিয়ে-থাকা একটা ছোট্ট চেন্ বাইরে থেকে চোখে পড়ে। কোণের দিকে একটা বাতি, তার ওপরে একেবারে হাল-ফ্যাশানের ঢাকনি। কার্ডবোর্ডের ওপর কাগজের টুকরো লাগিয়ে বানানো হয়েছে ঢাকনিটা।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এবার একটু ঘরের অন্যদিকে তাকাও। দেওয়ালের ধারে একখানা পুরনো ডিভান, তার ওপরে নীল রঙের ফুল-কাটা কাপড়ের ঢাকনা। বিছানার চাদর-টাদরগুলো ঐ ডিভানটার পেছনে ডাঁই করে রাখা হয়েছে (সেগুলো অবশ্য একটু-আধটু চোখেও পড়েছে)। ডিভানটার ওপর দিকে একটা বাতি। এটার ওপরেও হাল-ফ্যাশানের ঢাকনি লাগানো। খানিক দূরে বইয়ের তাক, কাগজের মলাট দেওয়া বইয়ে ভর্তি। এসব বই একা পেটারেরই। তাকের পাশে, দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট আয়না ঝুলছে। আর মেঝের ওপরে ছোট্ট একখানা যন্ত্রপাতির বাক্স মূর্তিমানের মত বসে আছে—ওটাকে রাখার জন্যে কোন লাগসই যায়গা বুঝি খুঁজে পায়নি পেটার (ঐ বাক্সটার মধ্যে কী নেই ? হাতুড়ি বলো হাতুড়ি, ছুরি বলো ছুরি, কিম্বা স্ক্রু-ড্রাইভার—সব পাবে ওর মধ্যে। আমি কতবার দেখেছি)।

বইয়ের তাকের কাছে আর একখানা তাক, কাগজ দিয়ে ঢাকা। কাগজগুলো কোন একসময় সাদাই ছিল, এখন বিবর্ণ, রঙ-চটা। তাকটা বানানো হয়েছিল দুধের বোতল-টোতল রাখার জন্যে, কিন্তু এখন ওটাও বইপত্তোরের জন্যেই বরাদ্দ হয়ে গ্যাছে। বইপত্তোরের চাপে

ডাকটার করুণ অবস্থা! দুধের বোতলগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে, যন্ত্রপাতির বাক্সটার পাশে।

তৃতীয় দেয়ালটাতে ঝুলছে একটা কাঠের বাক্স। ওটাতে কমলালেবু কিম্বা চেরি জাতীয় ফল-টল রাখলেই মানানসই হত। তার বদলে বাক্সটাতে কী রাখা হয় জানো? দাড়িতে সাবান ঘষার বুরুশ, সেফ্‌টি রেজর, খানিকটা প্লাস্টার, পেট খারাপের ওষুধ—এইসব হাবিজাবি। তার পাশটাতে চোখে পড়বে ভ্যান্ ডান্ পরিবারের শিল্পকলার নমুনা—কার্ডবোর্ডের তৈরী একখানা দেরাজ। দেরাজটার সামনে ঝুলছে একখানা পর্দা। পর্দাটা সত্যি সুন্দর। অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করে নিজের মায়ের কাছ থেকে পর্দাটা হাতিয়েছে পেটার। দেরাজ ভর্তি জামা, প্যাণ্ট, ওভারকোট, মোজা, জুতো, আরও নানান পোশাক-আশাক। আর দেরাজটার মাথার ওপরে নানান পাঁচমিশেলী জিনিসের গাদা, আলাদা করে কোনটাকে চেনা যায় না।

আর হ্যাঁ, ছোট ভ্যান্ ডান্ মশাইয়ের ঘরের মেঝেটাও দেখার মত। মেঝেতে তিনখানা খাঁটি পারস্যের গাল্‌চে পাতা আছে। ওহ্, কী রঙ গাল্‌চেগুলোর, একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু দামী দামী গাল্‌চেগুলোর কী পরিণতি বলো! একটা এবড়ো-খেবড়ো মেঝের ওপর এলিয়ে-মেলিয়ে পড়ে আছে।

দুটো দেয়াল সবুজ চট দিয়ে ঢাকা, বাকি দুটো সিনেমার অভিনেতাদের ছবিতে আর নানান পোস্টারে ছয়লাপ। এখানে-ওখানে ময়লার দাগ, নোংরার ছোপ। হবেই তো। এই টুকু জায়গায় কাঁড়িখানেক জিনিসকে ঠ্যাস্ না ঠ্যাস্ পুরে দিলেই হল? দেড় বছরে ও-সব ময়লা তো হবেই। ছাদটার অবস্থাও সুবিধের নয়, ফুটোটুটো দেখা দিয়েছে। জল পড়ে। জল আটকানোর জন্যে ছাদের গায়ে খানকতক কার্ডবোর্ডের টুকরো লাগিয়ে দিয়েছে পেটার। টুকরোগুলোর দিকে তাকাও—জলের দাগে একেবারে ভর্তি। ও দিয়ে কি আর জল আটকানো যায়?

তাহলে, ঘরের ব্যাখ্যানা শেষ। ওহ্ হো, চেয়ারগুলোর কথা বলতে ভুলেছি। একটা চেয়ার বেশ পুরণো, কাঠের তৈরী, হাতল লাগানো। বসার জায়গাটায় ছোট ছোট ফুটো করা—মানে ভিয়েনার ধাঁচের চেয়ার আর কি। দ্বিতীয় চেয়ারটা সাদা রঙের। এটাতে বসে আগে খাওয়া হত। গত বছর পেটার এটা হাতিয়েছে অনেক বলে-কয়ে। প্রথমটায় ও চেয়ারের গায়ের রঙটা ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে শুরু করেছিল। নতুন করে রঙ লাগানোর ধান্দা ছিল আর কি। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। কাজে কাজেই চেয়ারটা এখন খানিক সাদা, খানিক কালো, আর পা রাখার জন্যে একটা মোটে কাঠ রয়েছে (অন্যটা দিয়ে উনুন খোঁচানো হয়)। সব মিলিয়ে চেয়ারটা বেশ বদখত চেহারা নিয়েছে। তবে কি না জায়গাটা ঘুপ্‌চি মতন বলে ওটা তেমন নজরে পড়ে না।

রান্নাঘরের দিকের দরজাটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। গোটা কতক হুক-ও রয়েছে। হুকগুলোতে ঝুলছে কিছু ন্যাতা, একটা ঝাড়ু।

এতসব দেখার পর, ঘরটার সব কিছুই তো জানা হয়ে যায়—তাই না? না, ঘরের বাসিন্দাটিকে এখনও জানা হয় নি। এবার তার কথাই বলি।

সপ্তাহের অন্য দিনগুলোয় পেটারকে যেমন দেখায়, রবিবার কিন্তু ঠিক তেমনটা দেখায় না। সারা সপ্তাহ ধরে ও ওভারঅল পরে, মোটে ছাড়তে চায় না। ওটাকে বেশি কাচাকাচি করতেও দেয় না। কী যে ওর মাথায় আছে, কে জানে বাবা! হয়ত ভাবে বেশি কাচাকাচি করলে প্রিয় পোশাকটা নষ্ট হয়ে যাবে। তা সে যা-ই হোক, ঐ ওভারলটা সদ্য কাচা হয়েছে, নীল রঙটা বেশ ঝিকমিক করছে। গলায় একখানা নীল রুমাল বাঁধে পেটার। এটাও ওর খুব প্রিয় জিনিস। বাদামী চামড়ার একটা মোটকা কোমরবন্ধ আর সাদারঙের পশমী মোজা—এইসব মিলে-জুলে পেটারের সারা সপ্তাহের পোশাকের ছবিটা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু রোববার ও একেবারে অন্য

মানুষ! সেদিন বাবুর পরণে ওঠে ঝকমকে স্যুট, দারুণ একজোড়া জুতো, জামা, টাই—একেবারে ফিট্‌বাবু যাকে বলে!

এই তো গেলো ওর পোশাক-আশাকের বর্ণনা। মানুষটার সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়—হালে ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা গোটাগুটি বদলে গেছে। আগে মনে হত ছেলেটা মাথামোটা, গেঁতো মার্কা। কিন্তু এখন দেখছি মোটেই তা নয়। সব্বাই মনে করে ও বেশ চড়্‌কো হয়ে উঠেছে। আমি জানি, মনে-প্রাণে জানি, ও খুব সৎ, উদার। স্বভাবে নম্র, অন্যের জন্যে এগিয়েও আসে। মনটাও খুব অনুভূতিপ্রবণ। একটা জিনিস ও খুব ভালবাসে—বেড়াল! মুশ্‌চি আর মফি-কে পেলে ওর যেন আর কিছু লাগে না। ওর জীবনে যে ভালবাসার বড় অভাব, এটা হয়ত বেড়াল দুটোও বোঝে। সেই অভাবটাই যেন পূরণ করার চেষ্টা করে ওরা।

পেটার মোটেই ভীতুমার্কা নয়, বরং বেশ হিম্মৎদার। আবার ওর বয়সী অন্য ছেলেদের মতন ওপর-চালাক ও নয়। মাথামোটাতো নয়ই, বরং স্মৃতিশক্তিটা বেশ ভালো। ওকে যে দেখতে দারুণ, তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। চুলগুলো—আহা, বাদামী রঙের একমাথা ঢেউখেলানো চুল। ধূসর-নীল চোখ, আর মুখটা—এই মুখের বর্ণনাটা আমি কখনোই ঠিক ঠিক করে উঠতে পারি না। যুদ্ধ শেষ হলে পর এই বইটাতে আমি ওর ছবি সেঁটে রাখবো। এ বাড়ির অন্য সকলের ছবিও রাখবো। আর ছবি দেওয়া থাকলে ওর মুখের বর্ণনা দেওয়ার আর দরকারটা কী বলো!

স্বপ্ন

১২ মার্চ, ১৯৪৪

গল্পটা শুরু করার আগে দু'পাঁচ কথায় আমার জীবনের কথাটা একটু সেরে নিই।

মা-কে হারিয়েছি অনেকদিন (কোনদিন তাঁকে দেখিই নি)। বাবা আমার জন্য তেমন সময় দিতে পারেন নি। মা যখন মারা যান, তখন আমার দু বছর বয়স। এক চমৎকার দম্পতির হাতে আমাকে তুলে দেন বাবা। সেখানে পাঁচ বছর ছিলুম ওদের ওখানে। বোর্ডিং-স্কুলে যখন পাঠানো হয় আমাকে, তখন আমি সাত বছরের। চোদ্দ বছর বয়স অব্দি সেখানেই কেটেছে। তারপর আবার বাবার কাছে ফিরে আসি। আমি আর বাবা এখন একটা মেস বাড়িতে থাকি, আমি উচ্চবিদ্যালয়ে পড়তে যাই। সবটাই খুব সাদামাটা আমার জীবনে। কিন্তু জ্যাকে আসার পর সবটাই পাল্টে গেল।

জ্যাকে আর ওর বাবা-মা আমাদের মেস বাড়িতেই ভাড়াটে হিসেবে এসে ওঠে। প্রথমটায় দু' চারবার সিঁড়িতে ওর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। হঠাৎই একদিন পার্কে দেখা। তারপর থেকে আমরা দুজনে বেশ কয়েকবার বনের মধ্যে বেড়াতে গেছি।

দারুণ ছেলে জ্যাকে। একটু লাজুক গোছের, কম কথা বলে। হয়ত ওর ঐ গুণটাই আমাকে টেনেছিল। এখন তো প্রায়ই আমি ওর ঘরে যাই, ও-ও আসে আমার ঘরে।

এর আগে পর্যন্ত কোন ছেলের সঙ্গে আমার এতটা বন্ধুত্ব হয়নি। আমাদের ক্লাসের ছেলেগুলোর থেকে ও একেবারেই আলাদা ধরণের।

ঐ ছেলেগুলোর কাজ হচ্ছে শুধু বকবক করা আর লম্বাই-চওড়া কথা বলা।

নিজের সম্বন্ধে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, জ্যাকের সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করলুম। ওর মা-বাবার মধ্যে তেমন মিল নেই, প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। এতে ওর খুব অসুবিধে হয় নিশ্চয়ই, কেননা ও খুব শান্তিপ্রিয়। কোলাহল ওর একদম ভালো লাগে না।

বেশির ভাগ সময় আমাকে একলাই থাকতে হয়। নিজেকে খুব দুঃখী মনে হয়, নিঃসঙ্গ মনে হয়। কোনদিন তো মা-কে পাই নি, আর মনের মতন বন্ধুও পাই নি—তাই হয়ত এমনটা হয়। জ্যাকেরও একই অবস্থা। ওরও কোন মনের মতন বন্ধু নেই। আমি ভাবতুম—মনের কথা বলার মত একজন বন্ধু ওরও খুব দরকার। কিন্তু আমি ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারছিলুম না। হাবিজাবি কথাতেই সময় কেটে যেতো।

একদিন ও আমার ঘরে এল। আমি একটা গদিতে বসে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলুম। ও বলল, 'আমি আসায় তোমার কোন অসুবিধে হল না তো' ?

ওর দিকে চোখ মেলে বললুম, 'এতটুকুও না। আমার পাশে বোসো। আচ্ছা, তুমি কি স্বপ্ন দেখায় বিশ্বাস করো না' ?

ও বলল, 'নিশ্চয়ই করি। আমিও তো বসে বসে কতই না স্বপ্ন দেখি। এটাকে আমি বলি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকানো'।

'বাহ্, ভালো বলেছো তো। কথাটা মনে রাখবো।'

'আচ্ছা'—বলে, অল্প হাসল ও। এই রকম করে মাঝে মাঝে হাসে ও। ওর এই হাসিটার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কখনও।

আরো কিছু এলোমেলো কথা বললুম আমরা। তারপর ও চলে গেলো।

আবার একদিন এল ও। সেদিনও আমি ঠিক একই জায়গায়

বসে ছিলুম। ও এসে জানলার পাশটাতে বসল। প্রকৃতি সেদিন মেজাজী চেহারায় ফুটে ছিল চারপাশে। আকাশ ঘন নীল (অত ওপরে বসে আমরা, অন্তত আমি, কোন বাড়ি-ঘর দেখতে পাচ্ছিলুম না)। সামনের কাঠবাদাম গাছটার পাতাহীন শাখায় টলমলে শিশির-কণা। গাছের ডালগুলো হাওয়ায় দুলছে ধীরে ধীরে, শিশিরকণা-গুলোয় ঠিকরে পড়ছে রোদ্দুর—যেন এক একটা ঝিকমিকমিক হীরে-দানা। জানলার ও-ধারে শঙ্খচিল আর অন্য কিছু পাখ্-পাখালির ওড়াউড়ি ডাকাডাকি।

আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই। একই ঘরে, পরস্পরের খুব কাছাকাছি আমরা দুজন, অথচ কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছিই না। চোখ আমাদের আকাশে, কথা শুধু নিজের সঙ্গে নিজের। আমি 'আমাদের' বললুম, কারণ আমি নিশ্চিত যে ওর মনেও তখন একই ভাব খেলা করছিল। নীরবতা ভঙ্গ করার কোনরকম চেষ্টাই করে নি জ্যাকে।

মিনিট পনেরো এইভাবে কেটে যাওয়ার পর, ও বলল, 'সৌন্দর্য আর শান্তির মধ্যে ডুবে যেতে পারলে সব ঝগড়া-অশান্তিকে একেবারে পাগলামি বলে মনে হয়। যাকিছু নিয়ে লোকে হৈ-চৈ করে, সব মনে হয় অপ্রয়োজনীয়। তবে আমি নিজেও অবশ্য সবসময় ঠিক এরকমভাবে ভাবতে পারি না'।

একটু লাজুক-লাজুক চোখে আমার দিকে তাকালো ও। হয়ত ভাবছিল ওর কথাটা আমি ঠিকমত বুঝতে পারিনি। আমি বুঝতে পারলুম, ও আমার কাছ থেকে কোন উত্তর আশা করছে। খুশিতে ভরে উঠল মনটা। এতদিনে এমন একজনকে পেয়েছি, যার কাছে মনের সব কথা বলা চলে।

বললুম, 'আমার কী মনে হয় জানো? যে সব লোকের সম্বন্ধে আমাদের কোন টান নেই, যাদের সম্বন্ধে আমরা একেবারে উদাসীন, তাদের সঙ্গে যাদেরকে আমরা পছন্দ করি তাদের সঙ্গেও মতের অমিল

হতে পারে। কিন্তু সেটা একেবারেই অন্য ব্যাপার। তারা কখনো উত্যক্ত করলে মনে বড্ডো আঘাত লাগে।

'তুমি সত্যিই তাই ভাবো? কিন্তু তুমিও তো তেমন ঝগড়া-ঝাঁটি করো না, তাই না?'

'তা করি না বটে, তবে ব্যাপারটা বুঝি। সবথেকে খারাপ ব্যাপারটা কী জানো?' পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষই একেবারে নিঃসঙ্গ, একলা।'

'মানে'? সরাসরি আমার চোখে চোখ রাখল জ্যাকে। কিন্তু আমিও একরোখা। ওকে সাহায্য করতেই চাইছিলুম আমি।

'আমি বলতে চাই যে, বেশির ভাগ মানুষই তার নিজের মধ্যে একেবারে একা—তা সে বিবাহিতই হোক আর অবিবাহিতই হোক। নিজের সব চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতির কথা খুলে বলার মত লোক তারা পায় না। আমিও পাইনি। এটাই আমার সবথেকে বড় দুঃখ'।

জ্যাকে শুধু বলল, 'আমারও তাই'।

আবার আমরা আকাশের দিকে চোখ মেললুম। খানিক পরে ও বলল, 'সত্যি, মনের সব কথা খুলে বলার মত কাউকে যারা পায় না, তারা জীবনে কতকিছুই না হারায়। ঠিক এই চিন্তাটাই আমাকে হতাশ করে দেয়'।

বললুম, 'না, এ-কথাটা আমি মানতে পারছি না। হতাশা সবার মধ্যেই আসে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমার সারা জীবনটাই খুব দুঃখের হবে। আসলে হতাশ অবস্থায় তুমি কী চাও, কোন্ জিনিসটা খোঁজো? সুখ। মনের কথা খুলে বলার মতন কাউকে না পেলেও, নিজের মধ্যে একবার সুখের খোঁজ পেলে তা কিন্তু কখনোই হারিয়ে যায় না, বুঝলে'?

'তুমি কিভাবে সুখের খোঁজ পেলে'? শুধোল জ্যাকে।

উঠে পড়ে বললুম, 'এসো'। বলে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলুম ছাদে। আমার পিছনে ও। নানান জিনিসপত্র রাখার মত একটা

ঘর ছিল ছাদে। ঘরটার একখানাই জানালা। বাড়িটা খুব উঁচু। তাই জানালায় চোখ রাখতে ভেসে উঠল অনেকখানি আকাশ।

বললুম, 'সুখ যদি পেতে চাও, তাহলে রোদ ঝলমল একটা দিন দেখে বেরিয়ে পড়ো বাইরে। আকাশটা সেদিন যেন খুব নীল থাকে। কিম্বা এইরকম কোন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে, ঐ ঝকমকে নীল আকাশের নিচে আমাদের এই শহরটার দিকে চোখ মেলো। দেখবে সুখের খোঁজ তুমি পাবেই, হয়ত একটু দেরি হতে পারে। আমার কী হয়েছিল জানো? তখন আমি একটা বোর্ডিং-স্কুলে পড়ি। জায়গাটা আমার একটুও ভালো লাগতো না। যতই বড় হচ্ছিলুম, ততই খারাপ লাগছিল জায়গাটাকে। তা, একদিন বিকালে জলার মধ্যে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অনেকদূর চলে গিয়েছিলুম। অনেকটা দূরে গিয়ে একজায়গায় বসলুম। মাথার মধ্যে তখন অজস্র স্বপ্নের ভীড়। খানিক পরে সম্বিত ফিরতে দেখি—আরে, দিনটা কী ঝলমলে! তার আগে পর্যন্ত নিজের বিষণ্ণতার মধ্যে এমন ডুবে ছিলুম যে ঐরকম সুন্দর দিনটা আমার নজরেই পড়েনি। অনুভব করলুম, আমার চারপাশে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। ব্যস, অমনি আমার সব বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তার মেঘ কোথায় ভেসে বেরিয়ে গেলো। আমার সামনে তখন শুধু দুটো জিনিস—সৌন্দর্য আর সত্য।

'আধ ঘণ্টাটাক বসে থাকার পর, ফিরে এলুম স্কুলে। তখন আরে আমার মধ্যে হতাশার লেশ মাত্রও নেই। সবকিছুই সুন্দর, সবকিছুই ভালো। সত্যিই তো তাই। পরে বুঝেছি সেইদিন বিকালেই আমি প্রথম নিজের মধ্যে সুখের খোঁজ পেয়েছিলুম। আর এ-ও বুঝেছি যে, যে-কোন অবস্থার মধ্যেই সুখের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে'।

জ্যাকে শুধোলো, 'আচ্ছা, এর ফলে কি তুমি পাল্টে গিয়েছিলে'?

বললুম, 'হ্যাঁ, পাল্টে গেছলুম তো বটেই। নিজেকে তৃপ্ত মনে হয়েছিল। তবে সবসময় সেটা ধরে রাখতে পারি না। এখনও অনেক সময় অনেক ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হই, মেজাজ খারাপ করি।

কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়ি না কখনও। মানুষের বেশিরভাগ দুঃখই মানুষ নিজে তৈরী করে, আর সুখের জন্ম হয় আনন্দের মধ্যে থেকে —এইটুকু আমি শিখেছি'।

কথা শেষ করে দেখলুম, ও তখনও তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেছে। হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে ও বলে

'আমি এখনও পর্যন্ত সুখের খোঁজ পাইনি, কিন্তু অন্য একটা জিনিস আমি পেয়েছি। আমি এমন একজন মানুষের খোঁজ পেয়েছি, যে আমাকে বোঝে'।

ও কী বলতে চায়, বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি। তারপর থেকে আমাকেও আর নিঃসঙ্গ থাকতে হয়নি কখনো।

কিটি

৭ই আগস্ট, ১৯৪৩

ঠিক আমাদের পাশের বাড়িটাতেই কিটিরা থাকে। জানলা দিয়ে রোজ দেখতে পাই, মেয়েটা খেলা করছে উঠোনে। মাথার চুলগুলো কোঁকড়া-কোঁকড়া ধূসর-সোনালী, আর চোখদুটো ঝকঝকে নীল। পরার জন্মে ওর একটাই আটপৌরে সূতীর ফ্রক আছে আর রবিবারের জন্মে আছে খয়েরী-রঙা একটা ভেলভেটের ফ্রক।

কিটির মা খুব মিষ্টি মহিলা, কিন্তু বেচারার বাবা নেই। কাপড়-জামা ধোয়ার কাজ করেন ওর মা। দিনের বেলাটা অনেক সময়ই তিনি বাড়িতে থাকতে পারেন না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড়-জামা কেচে-কুচে দিয়ে আসেন। রাত্তিরবেলায় ঘরে ফিরে আবার খদ্দেরদের জামা-কাপড় নিয়ে ধুতে বসেন।

কখনো কখনো অনেক রাত্তির অব্দি তাঁর গালচে ঝাড়ার শব্দ শুনতে পাই। তারে ঝুলিয়ে সেগুলোকে ধোয়া-মোছা করেন কিটির মা। কিটিরা ছ'ভাই-বোন। একেবারে ছোট্টটা ভীষণ চ্যাচায়। ওদের মা যখনই বলেন, 'যাও, এবার শুতে যাও সব', অমনি ছোট্টটা ওর এগার বছরের দিদির জামা ধরে ঝুলে পড়ে।

কিটির একটা মিসমিসে কালো বেড়ালছানা আছে। একেবারে নিগ্রোদের মতো ভূসো কালো। ওটাকে খুব যত্ন-আত্তি করে কিটি। প্রত্যেকদিন রাত্তিরে শোয়ার সময় মেয়েটা ডাকে, 'কিটি, ও কিটি, কিটিরে!' এই জন্মে সবাই মেয়েটাকেই কিটি বলে ডাকে। ওটা তো আর ওর আসল নাম নয়! দুটো খরগোশও আছে ওর। একটা

সাদা রঙের, আর একটা বাদামী। ঘাসের ওর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলে বেড়ায় খরগোশ দুটো।

মাঝে-মধ্যে অন্য সব বাচ্চাদের মতো কিটিটাও বেজায় দুষ্টু হয়ে ওঠে। ছোট ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে বেজায় ঝগড়া শুরু করে দেয় ও। ওহ্, সে একটা দেখার মতো ব্যাপার বটে! ভাইগুলোকে আচ্ছা করে ঠ্যাঙায়, পা ছোঁড়ে, কামড়ে-টামড়েও দেয় বোধহয়। আর খাণ্ডারণী দিদির ভয়ে ভাইবোনগুলো যেন সিঁটিয়ে যায় একেবারে।

ওর মা হয়ত ডেকে বলেন, 'ও কিটি, এই কাপড়গুলো যে দিয়ে আসতে হবে মা।' ব্যাস, অমনি দু'কানে দুটো আঙুল পুরে দেয় কিটি। ভাবখানা এমন, যেন মায়ের কোন কথাই ও শুনতে পায়নি। ফুট-ফরমাশ খাটতে কিটির ঘোর আপত্তি, তবে কাজ এড়ানোর জন্যে মিছে কথা-টথা কিন্তু বলে না ও। না, মিছে কথা বলার ধাত ওর একদমই নেই। ওর নীল নীল স্বচ্ছ দুটো চোখের দিকে তাকালেই সেটা বেশ বোঝা যায়।

কিটির এক দাদা আছে, বছর ষোল বয়স হবে, তার নাম পেটার। কোন্ একটা আপিসে বেয়ারার কাজ করে। ভাইবোনদের ওপর দাদাটা মাঝে-মাঝে এমন তম্বি চালায় যে, সে আর কী বলব। যেন ও-ই ওদের বাবা! ওর সঙ্গে লাগার মতো বুকের পাটা কিটিরও নেই। বাব্বা, যা জোর ঘুঁষি চালায় না দাদাটা! তবে ওর কথা মেনে চললে এটা-সেটা খাওয়াতে আপত্তি নেই তার। দাদা পেটার তখন এটা-ওটা দান খয়রাত করে, আর মিষ্টি খেতে তো দারুণ ভালবাসে কিটি।

রোববারে বেজে ওঠে চার্চের ঘণ্টা। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চার্চে যান কিটির মা। নিজের বাবার জন্যে প্রার্থনা করে কিটি। ওর বাবা তো স্বর্গে চলে গেছেন। মায়ের জন্যেও প্রার্থনা করে ও—অনেক, অ-নে-কদিন বেঁচে থাকুক আমাদের মা মণি। চার্চ থেকে ওরা সবাই এদিক-ওদিক একটু বেড়াতে যায়। বেড়াতে কিটির ভীষন ভালো লাগে। পার্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারলে মনটা ওর আনন্দে নেচে ওঠে।

চিড়িয়াখানায় যেতে পারলে তো আর কথাই নেই। তবে কিনা, সেই সেপ্টেম্বর মাস ছাড়া তো ওদের আর চিড়িয়াখানায় যাওয়া হয়ে ওঠে না। আসলে সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ২৫ সেন্ট করে দিলেই চিড়িয়াখানায় ঢুকতে পারা যায়।[১] কিটির জন্মও কিন্তু ঐ সেপ্টেম্বর মাসেই। জন্মদিনের উপহার হিসেবে কোন কোন বছর ও চিড়িয়ানায় যাবার বায়না ধরে। অন্য কিছু উপহার দেবার সামর্থ তো ওর মায়ের নেই।

সারাটা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কোন কোনদিন ওর মা রাত্তিরবেলা দুঃখে কষ্টে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিটি তখন সান্ত্বনা দেয় তাঁকে, বলে —আমি বড়ো হলে তোমাকে এটা কিনে দেবো, ওটা কিনে দেবো, দেখো তুমি। কিটির ভীষণ ইচ্ছে করে খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে উঠতে, অনেক টাকা রোজগার করতে, সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরতে, আর বোনদের মিষ্টি কিনে দিতে, এখন যেমন পেটার দাদা কিনে দেয় ওদের। কিন্তু এ-সব কিছু করতে হলে কিটিকে যে অনেক কিছু শিখতে হবে, এখনও যে অনেকদিন ধরে যেতে হবে ইস্কুলে।

ওর মায়ের ভারি ইচ্ছে যে ও গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের ইস্কুলে ভর্তি হোক। কিন্তু সেদিকে কিটির একদমই ঝোঁক নেই। ঐ-সব বিদ্যে শিখে-টিখে শেষকালে হয়ত কোন নাক উঁচু মহিলার বাড়িতে কাজ করতে যেতে হবে। রক্ষে কর, মাগো! তারচে' বরং কোন কারখানায় কাজ-টাজ করতে পেলে বেশ হয়। জানলা দিয়ে ও তো রোজই দেখতে পায়, কারখানায় কাজ-করা হাসি-খুশি মেয়েরা কেমন গল্প-গুজব করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে। কারখানার মধ্যে তুমি কখনো একলা থাকবে না, সব সময়ই গল্পগাছা করার লোকজন পাবে সেখানে। আর গল্প-গুজব করতে পেলে তো কিটি একেবারে চাঁদ পায় হাতে। ওর এই বকুন্-তুড়ে স্বভাবের জন্যেই ওকে একবার ইস্কুল ঘরে এক কোণে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

স্কুলের মাষ্টার মশাইকেও কিটি ভারি ভালবাসে। মাষ্টার মশাই এর স্বভাবও খুব মিষ্টি, ভীষণ বুদ্ধিমান লোক তিনি। ওহ্, ঐ অতো পড়া,

অতো জানা—সোজা কথা নাকি ! তবে বাপু, অতো সব না জানলেও চলে। মা হামেশাই বলেন—যে-সব মেয়েরা বেশি চালাক চতুর বিচ্ছেবতী হয়ে ওঠে, তাদের বরাতে বর-টর জোটে না। কিটি বেজায় ঘাবড়ে যায় মনে মনে—না বাবা, বর-টর না না জুটলে খুব মুস্কিলে পড়ে যেতে হবে। ভাবে—বড়ো হলে আমারও তো ছেলে-মেয়ে হবে, কিন্তু তারা যেন আমার ভাই-বোনদের মতো এতোটা দুষ্টু না হয়। তারা হবে আরও সুন্দর, আরও মিষ্টি। ভাইবোনদের শন-রঙা চুলগুলো একটুও কোঁকড়ান নয়। কিন্তু ওর ছেলে-মেয়েদের থাকবে মাথাভর্তি বাদামী-রঙা কোঁকড়া কোঁকড়া নরম চুল। আর কিটির সারা গায়ে যেমন অজস্র ফুটকি ফুটকি দাগ, তেমন কোন দাগ টাগ থাকবে না ওর ছেলে-মেয়েদের শরীরে। ওরা অনেকগুলো ভাই-বোন, কিন্তু এতগুলো ছেলে-মেয়েও চায় না ও। দু'তিনটে বাচ্চা থাকলেই চলবে, কিন্তু···· ওহ্, সে-সবের এখনও যে কত কত দেরী········

ওর মা ডাকেন, 'কিটি, ও কিটি। দুষ্টু মেয়ে, কী করছিস চুপচাপ বসে ? ওহ্, আবার স্বপ্ন দেখছিস বুঝি ? যা যা, শুতে যা এবার।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কিটির বুক ঠেলে। আলো-ঝলমল ভবিষ্যতের ছবি দেখার সময় কেউ যদি বাধা দেয়—কেমন লাগে তাহলে বলো ?

১। সেপ্টেম্বর মাসে যে-কোন লোক ২৫-টা ডাচ্ সেণ্ট দিয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকতে পারে। ২৫-ডাচ্ সেণ্ট মানে প্রায় ছ' পেন্স।

ইভার স্বপ্ন

৬ই অক্টোবর, ১৯৪৩

'শুভরাত্রি ইভা, এবার ঘুমোও।'

'শুভরাত্রি মামনি।'

খুটুস্ করে একটা শব্দ হল, নিভে গেলো ঘরের আলো। অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ শুয়ে রইলো ইভা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর চোখ সয়ে গেলো অন্ধকারে। জানালার পর্দাটা যদিও মামনি টেনে দিয়ে গেছেন, তবুও পর্দার ফাঁক দিয়ে চাঁদটা একেবারে সরাসরি চোখে পড়ছে। শান্তভাবে আকাশের শরীরে ফুটে রয়েছে চাঁদ—স্থির, হাসিভরা, সকলের বন্ধু ঐ চাঁদ।

'আহা, আমিও যদি ঐরকম হতে পারতুম', নরম গলায় নিজেকেই বলল ইভা।

'যদি ঐরকম শান্ত, দয়ালু হতে পারতুম, তাহলে সকলে আমাকে কত না ভালোবাসতো! কী ভালোই না তাহলে হতো!'

চাঁদের সঙ্গে নিজের তফাৎ নিয়ে ভেবেই চললো, ভেবেই চললো ছোট্ট ইভা। ভাবতে ভাবতে একসময় গভীর তন্দ্রার মধ্যে ডুবে গেলো ও, আর ওর ভাবনাগুলো ফুটে উঠলো স্বপ্ন হয়ে। স্বপ্নটার সব কথা পরের দিনও স্পষ্ট মনে ছিল ওর। তাইতো এখনও ও মাঝে-মাঝে ভাবে—আচ্ছা, সেদিন কি আমি শুধু স্বপ্নই দেখেছিলুম, নাকি সত্যি সত্যিই ঐ-সব ঘটেছিল?

একটা মস্ত বড় পার্কের গেটের কাছটাতে দাঁড়িয়ে, রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল ইভা। ঠিক ভেতরে যাবার সাহস পাচ্ছিল

না। তারপর যেই না ও পেছন ফিরতে যাবে, অমনি কোথা থেকে যে হাজির হলো ছোট্ট এক মেয়ে। ছোট্ট মেয়েটার আবার দু'খানা ডানা। হেসে বললে সে, 'যাও না ইভা, ভেতরে যাও। ও, তুমি বুঝি ভেতরে যাওয়ার পথ চেনো না ?'

লাজুক গলায় ইভা বললো, 'না গো ভাই, পথটা সত্যিই আমার চেনা নেই'।

'তা বেশ আমিই না হয় তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাই চলো'—এই না বলে ছোট্ট মেয়ে এগিয়ে এসে ইভার হাত ধরলো।

মা আর ঠাকুমার সঙ্গে হরেক রকম পার্ক-টার্কে ঘুরেছে ইভা, কিন্তু এমন সুন্দর কোন পার্ক তো আগে কখনো দেখেনি ও !

পার্কময় ছড়িয়ে আছে কত কত জানা-অজানা সুন্দর সুন্দর ফুল, গাছ, সবুজ ঘাসে-ভরা মাঠ, আর কত সব আজব আজব কীট-পতঙ্গ। তারপর হরেক রকম ছোট ছোট জীব-জন্তু, এই যেমন কাঠবিড়ালী, কচ্ছপ, খরগোশ এইসব। ছোট্ট মেয়েটা হাসছে আর বকেই চলেছে। ইভা সাহস করে কী একটা শুধোতে গেল, কিন্তু অমনি মেয়েটা ওর ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল চেপে ধরলো। বললো, 'আমি তোমাকে সবকিছু দেখিয়ে-বুঝিয়ে দেবো। একটা করে জিনিষ বোঝানোর পর যদি কিছু তুমি বুঝতে না পারো, তাহলে প্রশ্ন করে জেনে নিও। কিন্তু বাকি সময়টা তুমি কিন্তু একটাও কথা কইবে না, একদম চুপটি করে থাকবে, বুঝলে ! আর যদি তুমি মিছিমিছি কথা কও, তাহলে আমি তক্ষুণি তোমাকে বাড়িতে রেখে দিয়ে আসবো। ব্যস, তাহলে আর সব লোকের মতোই তুমিও মুখ্যু হয়েই থাকবে !

'এবার তাহলে শুরু করা যাক, কী বলো ? বেশ, এই হচ্ছে গোলাপ—ফুলেদের রাণী। কী সুন্দর দেখতে, আর কী দারুণ গন্ধ, তাই না ! ঐ দিয়েই তো সকলের মাথা বিগড়ে দেয় ও। আর ওর নিজের মাথাটাও বেশ ভাল ভাবেই কিন্তু বিগড়ে গেছে।

'গোলাপ দেখতে খুবই সুন্দর, মন-কাড়া, গন্ধে ভরপুর। কিন্তু

জানোতো ওর মনোমত কাজ না করলেই ও কিন্তু ফুঁসে ওঠে, কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। আসলে ও হচ্ছে একটা লাই-পেয়ে-পেয়ে বিগড়ে-যাওয়া ছোট্ট মেয়ে। এমনিতে ভারি চমৎকার, বেশ মিষ্টি। কিন্তু ওর গায়ে একবার হাত ছুঁইয়ে ছাখো, কিম্বা ওকে ছেড়ে অন্য কারুর দিকে তাকাও—ব্যস, অমনি বিবির পাপড়ি রাগে ঝলসে উঠবে। তখন দেখবে ওর গলায় হিংসে কেমন ঝরে ঝরে পড়ে। তবে কি না, ভীষণ রেগে গেলেও কিন্তু রাগটা কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। খুব গাল ফুলিয়ে কথা কয়, আর এমন একটা ভাব দেখায় যেন কিছুই হয় নি।

'কিন্তু ছোট্ট মেয়ে একটা ব্যাপারে যে আমার খট্‌কা লাগছে। মানে, গোলাপের স্বভাব যদি এইরকমেরই হয়, তাহলে সবাই ওকে ফুলেদের রাণী বলে কেন?' জিজ্ঞেস করলো ইভা।

'আসলে কী জানো, প্রায় সব লোকই বাইরের চাকচিক্যকেই আসল বলে ধরে নেয়। ফুলেদের মধ্যে কাকে রাণী করা হবে সে ব্যাপারে যদি মতামত নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে মাত্র জনাকয়েকই শুধু গোলাপের পক্ষে সায় দেবে না। গোলাপ যে আসলে খুবই রূপবতী ও মর্যাদাময়ী। ধরো, একটা সাধারণ ফুল, যার বাইরেটা গোলাপের মতো অত ঝকমকে নয়, কিন্তু তার অন্তরটা হয়তো অনেক মহান, অনেক গুণী হয়তো সে। গোলাপের বদলে কি তাকে রাণী বলে কেউ মেনে নিতে চাইবে? পৃথিবীর সব ব্যাপারে এ-ই চলেছে, বুঝলে!'

কিন্তু, তুমি নিজেও তো গোলাপকে খুবই সুন্দরী বলেই মনে করো, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা তো করিই। আর ওর ঐ নাক-উঁচু ভাবটা যদি ও ছাড়তে পারে তাহলে তো ওকে বেশ ভালোও বাসা যায়। কিন্তু যতদিন সকলে ওকে ফুলেদের রাণী বলে মনে করবে, ততদিন ও নিজের রূপকে আসলের থেকে অনেক বাড়িয়ে দেখবে, ওর ঐ দেমাকও কোনদিন কমবে না। এইসব দেমাকীদের আমি বাপু দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

'আচ্ছা, তাহলে তোমার কি মনে হয় লেনাও ঐরকম মিথ্যে দেমাকে ভগোমগো ? লেনাকেও তো দেখতে খুব সুন্দর আর ওরা খুব বড়লোক, তাই ও-ই আমাদের ক্লাশের সর্দার হয়ে উঠেছে।'

'শোনো তাহলে। আচ্ছা ধরো, পুঁচকে মেরীটা লেনার নামে কোন নালিশ করল। লেনা তখন কী করবে ? গোটা ক্লাশটাকে ও মেরীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবে, তাই তো ? কী করে বলো তো ? আসলে মেরী খুব সাদাসিধে আর গরীব বলে। আর তোমরা সকলেও তখন লেনার মিথ্যে কথাগুলোই মেনে নেবে। কেননা লেনা তাহলে তোমাদের ওপর রেগে যাবে। আর লেনা রেগে যাবে, ওরে ব্বাপ্‌রে! তোমাদের কাছে তো ওর রেগে যাওয়া আর হেডমাস্টার-মশাইয়ের রেগে যাওয়া প্রায় সমান ব্যাপার। ও রেগে গেলে তোমরা আর ওদের সুন্দর বাড়িটাতে যেতে পারবে না, সেই জন্যই ওকে তোমরা তোমাদের ওপর সর্দারি করতে দাও। বয়েস বাড়লে এই লেনার মতন মেয়েরা একেবারে একলাটি হয়ে পড়বে। কেননা বয়েস বাড়লে বাকিরা বুঝতে পারবে, ও কত ভুল কাজ করতো। তা, সারাটা জীবন কি আর একা-একা থাকা ভালো ? মোটেই না। তাই ঐ লেনার মতন মেয়েদের উচিৎ নিজেদের শুধরে নেওয়া।'

'আচ্ছা, তাহলে একটা কথা শুধোই। আমি কি অন্য সব মেয়েদের বলবো লেনার কথা না শুনতে ?'

'বটেই তো। প্রথমটা যদিও তোমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে যাবে লেনা, কিন্তু বুদ্ধি-শুদ্ধি বাড়লে বুঝতে পারবে, কত খারাপ কাজই না সে করেছে এতদিন। তখন ও তোমাকে খুব ভালোবাসবে, আর এখনকার থেকে অনেক ভালো ভালো বন্ধুও পাবে।'

'বুঝলুম। আচ্ছা ছোট্ট মেয়ে, এবার বলো দেখি, আমার মধ্যেও কি ঐ নাক-উঁচু গোলাপটার মতন কোনো মিথ্যে দেমাক-টেমাক আছে ?'

'ভ্যাখো ইভা, যারা নিজেরা এ-রকম প্রশ্ন করে, তাদের মধ্যে

ঐ-সব মিথ্যে দেমাক থাকে না। এ প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই সবথেকে ভালোভাবে দিতে পারবে, আর সেটাই তো দরকার…। যাক, এবার এগোই চলো। আচ্ছা, এই ফুলটা দ্যাখো, এই যে, এই ফুলটা। দারুণ, না?'

ঘণ্টার মত দেখতে একটা ছোট্ট নীল-রঙা ফুলের সামনে হাঁটু পেতে বসলো ছোট্ট মেয়েটা। বাতাসের তালে তালে ঘাসের মধ্যে এদিক-ওদিক দুলছে ফুলটা।

'এই ঘণ্টাকর্ণ ফুলটা ভারি কোমল, ভারি মিষ্টি আর একেবারে সাদা-সিধে। সবাইকে আনন্দ দেওয়াই হলো এর কাজ। চার্চে যেমন ঘণ্টা বাজিয়ে লোকজনকে ডাকা হয়, এ-ও তেমনি মাথা নেড়ে নেড়ে অন্য ফুলেদেরকে ডাকে। এই ঘণ্টাকর্ণ অনেক ফুলকে সাহায্য করে, তাদেরকে আনন্দ দেয়। ও কখনো একলা হয় না, সারাক্ষণই ওর ছোট্ট বুকখানা ভরে থাকে গানে গানে। গোলাপ ফুলের থেকে আমাদের ঘণ্টাকর্ণ অনেক সুখী, বুঝলে ইভা। কেউ ওর প্রশংসা করলো কি না করলো, তা নিয়ে মাথাই ঘামায় না ও। গোলাপ ফুল কিন্তু অন্যের কাছ থেকে শুধু সম্মান পাওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকে। সম্মান না পেলে ওর কাছে সব কিছু একেবারে পানসে। গোলাপের ঐ বাইরের চকমকে ভাবটা আসলে অন্যদের দেখাবার জন্যে, কিন্তু ভেতরটা ওর একেবারে ফোঁপরা, কোন সুখ নেই ওর মনে।

'এই ছোট্ট ঘণ্টাকর্ণ ফুলটা তেমন সুন্দর নয় বটে, কিন্তু ওর এমন সব খাঁটি বন্ধু আছে যারা ওর গুণের মর্যাদা দেয়। এ-সব বন্ধুরা কোথায় থাকে জানো? থাকে ঐ ফুলটার বুকের মধ্যেই।'

'কিন্তু ঘণ্টাকর্ণকেও তো বেশ সুন্দর দেখতে, না কি বলো'? ইভা শুধোয়।

'হ্যাঁ, সুন্দর তো বটেই, তবে গোলাপের মতো সুন্দর তো আর নয়! অথচ মজাটা দ্যাখো, গোলাপের মতন ঐরকম বাইরের চকমকে ভাবটাই বেশীর ভাগ লোক পছন্দ করে।'

'মাঝে-মাঝে কিন্তু আমারও খুব একা-একা লাগে। মনে হয়, চারপাশে অনেক লোকজন থাকলে বেশ হতো। এটা কি খুব খারাপ ?'

'না না ইভা, ওটা কোন ব্যাপারই নয়। যখন তুমি বড় হয়ে উঠবে তখন তোমার বুকেও বেজে উঠবে গান, দেখে নিও।'

'আচ্ছা এবার তোমার গল্পটা আবার শুরু করো দিকিন্।'

'বলছি শোনো,—এই বলে সেই ছোট্ট মেয়ে ওপরদিকে আঙুল উঁচিয়ে একটা মস্ত গাছ দেখালো। চোখ চেয়ে ইভা দেখে, বিরাট একটা কাঠবাদাম গাছ সেটা।

'গাছটা দারুণ, কী বলো ?' ছোট্ট মেয়ে শুধোল।

'হ্যাঁ, সত্যি চমৎকার। আচ্ছা, এই গাছটা কতদিনের' ? জানতে চাইলো ইভা।

'তা ধরো না, দেড়শো বছরের বেশি তো হবেই। কিন্তু এখনও কিরকম শক্তপোক্ত আছে দেখেছো ? এতোটা বয়স হয়েছে বলে মনেই হয় না। এই শক্তির জন্যে সবাই কাঠবাদাম গাছটাকে সম্মান করে। গাছটা কিন্তু সে সব সম্মান-টম্মানকে কেয়ারও করে না। নিজের শক্তি ঠিক কতোটা, তা সে জানে। কেউ ওকে ছাপিয়ে যাবে, সেটা মেনে নিতে মোটেও রাজি নয় ও। সবকিছুতেই নিজেকে ও বড় মনে করে। যতদিন বাঁচবো, ততদিন কারুর তোয়াক্কা রাখবো না—হচ্ছে ওর মনের কথা। ওপর ওপর দেখলে মনে হয় কাঠবাদাম গাছটা বুঝি খুবই উদার, সকলের কথা হয়তো ভাবে-টাবে। কিন্তু মোটেই তা নয়, বুঝলে ! কেউ কোন অসুবিধের কথা কিম্বা নালিশ-টালিশ নিয়ে ওর কাছে না এলেই ও খুশি হয়। গাছটা কি বিশাল, বেঁচেও রয়েছে কতকাল ! অথচ তা থেকে কাউকে একটু ভাগ দিতে সে একেবারেই নারাজ। এখানকার অন্য সব গাছ আর ফুলেরাও সেটা ভালভাবেই জানে। তাই কোন ঝামেলায় পড়লে এই কাঠবাদাম গাছটার কাছে ওরা কক্ষনো আসে না, সোজা চলে যায় ঐ দয়ালু পাইন গাছটার কাছে।

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও, কাঠবাদাম গাছে ঐ বিরাট বুকখানার মধ্যে

একটুখানি গানের ছোঁয়া আছে, বুঝলে। কেননা গাছটা পাখিদেরকে খুব ভালবাসে। পাখিদের জন্যে ওর বুকে একটুখানি ভালবাসার জায়গা সবসময়েই থাকে, আর সবসময়েই ও পাখিদেরকে কিছু না কিছু দেয়।'

'আচ্ছা ছোট্ট মেয়ে, কোন কোন মানুষও কি ঠিক এই কাঠবাদাম গাছটার মতন হয়?'

'এ কথাটা আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে ইভা! যাদের প্রাণ আছে, তাদের সকলকেই তো অপরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কাঠবাদাম গাছটাতো আর তার বাইরে নয়। গাছটা খুব খারাপ যে নয়, তা ঠিক। তবে সেরকম আবার ভালোও নয়। ও কারুর কোন ক্ষতি-টতি করে না,? নিজের মনে থাকে, আর তাতেই ও খুশি। আর কিছু কি জানতে চাও?'

'না না আর কিছু জানার নেই। আমি সবই বুঝতে পেরেছি। তুমি আমার মস্ত উপকার করেছো, ছোট্ট মেয়ে। এবার আমি বাড়ি যাই। আমাকে আরও অনেক কথা বলার জন্যে পরে আবার আসবে তো?'

'না গো, আর আসা হবে না। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো এখন'।

চলে গেলো সেই ছোট্ট মেয়ে। একসময় ঘুম ভাঙলো ইভার। ভোরের আলো ফুটছে, চাঁদটা গেছে হারিয়ে, আকাশের বুকে ভেসে উঠছে লাল সূর্য। পাশের বাড়ির ঘড়িতে ডিং-ডং ডিং-ডং করে সাতটা ঘণ্টা বাজলো। সকাল সাতটা।

স্বপ্নটা ইভাকে পাল্টে দিলো একেবারে। সেইদিন থেকে কোন খারাপ কথা বলে ফেললে কিম্বা কোন খারাপ কাজ করে ফেললেই ওর মনে পড়তো সেই ছোট্ট মেয়ের কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিতো নিজেকে। লেনার কাছে কিছুতেই ও আর মাথা নোয়াতো না। আর লেনার মতো মেয়েরা ঠিকই বুঝতে পারে যে কেউ যেন তাকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। খুব ক্ষেপে উঠতো লেনা। আর ইভা যখন খেলার সময় অন্য কোন মেয়েকে দলনেত্রী করতে চাইতো, তখন তো কথাই নেই! রেগে কাঁই হয়ে উঠতো লেনা। ওর কথা যারা মেনে চলতো, তাদেরকে ইভার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে খুব চেষ্টা করতো সে।

আস্তে আস্তে ইভা বুঝতে পারলো, মেরীর সঙ্গে লেনা যে রকম ব্যবহার করে, সে রকমটা ওর সঙ্গে আর করতে পারছে না। ও মনে মনে ভাবতো—মেরীটা যে আসলে বড্ড ছোট, ভীষণ ঠাণ্ডাঠুণ্ডি, ও কি আর লেনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস পাবে? মেরীর সঙ্গে ও যতোই মিশতে লাগলো, ততই বুঝতে পারলো—বন্ধু হিসাবে ঐ লেনার থেকে মেরী অনেক ভালো।

ইভা কিন্তু নিজের মা-কে সেই ছোট্ট মেয়ের ব্যাপারে কিছুই বলেনি। এর আগে পর্যন্ত মায়ের কাছে কোন কথাই লুকোতো না ও। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়ের কথাটা ও বলতে পারেনি মাকে। কেন যেন ওর মনে হয়েছে, মা বোধহয় ওর এইসব কাজ মেনে নেবেন না।

আহা, ছোট্ট সেই মেয়েটা কী সুন্দরই না ছিল! কিন্তু মা তো আর কোনদিন সেই বড় পার্কটায় যায়নি, মেয়েটাকেও ছাখেনি। কাজেই মেয়েটা যে কেমন ছিলো, তা আর এখন কী করে মাকে বোঝায় ইভা। কিন্তু ওর মা লক্ষ্য করলেন—মেয়েটা যেন অনেক বদলে গেছে। ও আজকাল অনেক দরকারী ব্যাপার-স্যাপায় নিয়ে কথা বলে, ছোটখাট বিষয় নিয়ে আর সে মোটেই রাগারাগি করে না। কিন্তু কেমন করে যে এই বদলটা ঘটলো, সেটা তো ইভা কখনো মুখ ফুটে বলে না। তাই ওর মা-ও তা জানার জন্যে কোনরকম জোরা-জুরি করেন না।

দিন কাটে। ইভা সবসময় সেই ছোট্ট মিষ্টি মেয়ের উপদেশগুলো মনে করে। আর কখনো অবিশ্যি মেয়েটার সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাত হয়নি। লেনা এখন আর ওদের ক্লাশের সর্দার নেই। এখন এক একজন করে মেয়ে পালা করে সর্দার হয়। এ ব্যাবস্থায় লেনা প্রথমটায় খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলো। কিন্তু রাগ-টাগ করে খুব সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে ও এখন বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে গেছে। সহপাঠিনীরা যখন দেখলো লেনা তার পুরনো খারাপ অভ্যেসগুলো কাটিয়ে উঠছে, তখন তারাও ওর সঙ্গে আর পাঁচজনের মতই সহজ ভাবে মিশতে শুরু করলো।

ইভা ঠিক করলো, এবার মা-কে সব কথা বলা দরকার।

ওর মা কিন্তু সব শুনে এতটুকুও অবাক হলেন না। তিনি বললেন, 'ঐ ছোট্ট মেয়েটা তোমার খুব উপকার করেছে, বুঝলে ইভা। যে কোন মেয়েকে এইসব উপদেশ কখনোই দিতো না সে। সবসময় মনে রাখবে তোমাকে সে কতখানি বিশ্বাস করেছিল। মেয়েটার কথা আর কারোর কাছে যেন বোলো না, বুঝলে তো! সে যা যা বলেছিল, সবসময় তা করার চেষ্টা করবে, কেমন!'

বড় হয়ে উঠতে লাগলো ইভা। ওর ভালো ভালো কাজের জন্যে সবাই ওর সুখ্যাতি করে। ওর যখন ষোল বছর বয়স, তখন ওদের পাড়ার সকলের কাছেই ওর নাম ছড়িয়ে পড়লো খুব দয়ালু, ভদ্র আর পরোপকারী মেয়ে হিসেবে। কোন একটা ভালো কাজ করলেই ওর বুকের মধ্যে একটা খুশির দোলা লাগতো। আস্তে আস্তে ও বুঝতে পারলো, 'বুকের মধ্যে গান বেজে ওঠা' বলতে ছোট্ট মেয়ে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলো।

বড় হবার পর হঠাৎই একদিন ইভা বুঝতে পারলো—সেই ছোট্ট মেয়েটা আসলে কে ছিলো। সেইদিন ও বুঝতে পারলো যে আসলে ওর নিজের বিবেকটাই স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠে ঠিকঠিক রাস্তাটা চিনিয়ে দিয়েছিল ওকে। ছোটবেলায় সেই ছোট্ট মেয়ে এসে ওকে ঠিক রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছিল বলে সারাজীবনই তার কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিলো আমাদের ইভা।

ক্যাথি

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

খামার-বাড়ির সামনেটায় পড়ে আছে একখানা ঢাউস পাথরের চাঁই, রোদ্দুর পড়ে ঝিক্‌মিক করছে। পাথরটার ওপরে বসে ছিল ক্যাথি। বসে বসে ভাবছিল ও, ভাবছিল অনেক কিছু। খুব শান্তশিষ্ট মেয়ে ক্যাথি। ঝলমলে জামা পরে পাথরে বসে কী ভাবছিল ও, আর কেউ তা জানে না। নিজের ভাবনাগুলোর কথা কক্ষনো কাউকে বলে না ও, সব চিন্তা নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখে যত্ন করে। কোন বন্ধু নেই ওর, বন্ধু জোটানো খুবই মুস্কিল ওর পক্ষে। মা ভাবেন —মেয়েটা আমার ভারি অদ্ভুত! আর ক্যাথিও সেটা বেশ বুঝতে পারে। ওর বাবা নিজের কাজকর্মে সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত, সবেধন নীলমণি ঐ একটামাত্র মেয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোন সময়ই পান না তিনি। ক্যাথি তাই নিজের মনেই একা একা ঘোরে-ফেরে। তা, নিজের মনে ভালোই থাকে ও। এছাড়া আর কী-ই বা করার আছে ওর বলো?

কিন্তু এই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যেবেলায় ভুট্টাক্ষেতের দিকে চোখ মেলে, ওর বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। আহা, ঐ মেয়েগুলোর সঙ্গে একটু খেলা করতে পারলে কী ভালোই না লাগতো! মেয়েগুলো ওখানে ছোটাছুটি করছে, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। কী মজা ওদের, সত্যি! মেয়েগুলো সব এগিয়ে আসছে এইদিকেই, আরও এগিয়ে আসছে। ওরা কি একেবারে ক্যাথির কাছটিতে চলে আসবে? আহ্, ওরা আসছে, আসছে—কিন্তু একি? ওরা যে

ওকে নিয়েই হাসাহাসি করছে! ওরা ওর আসল নামটা বলছে না, বলছে ওর ক্যাপানো নামটা—'হেই পাগলী-বেড়াল, হেই!' বাচ্চা-গুলো প্রায়ই ওকে এই নামে ডেকে ক্যাপায়, আর এই নামটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না ও।

ক্যাথি বুঝি কেঁদেই ফেলবে! এক ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে হত, কিন্তু তাহলে যে ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়েগুলো ওকে নিয়ে আরও হাসাহাসি করবে! আহা, বেচারা। প্রায়ই ওর নিজেকে খুব একলা মনে হয়, অন্য সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর খুব হিংসে হয় ওর....

'ক্যাথি, ঘরে আয়, ও ক্যাথি। খাবার দিয়েছি!' মায়ের ডাক শুনে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ও, বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো আরেকটা দীর্ঘশ্বাস।

বিষণ্ণ মুখে, ধীর পায়ে, ঘরে ঢুকলো ও। তাই না দেখে ওর মা বলে উঠলেন, 'ওহ্, মুখখানার কী ছিরি ছাখো! তুই কি একটু হাসিখুশি থাকতে পারিস না, অ্যাঁ! মুখ ফুটে কি কিছু বলতেও শিখবি না!' তিরিক্ষি মেজাজে ধমকে উঠলেন ওর মা। উনি চান মেয়ে হবে খুব হাসিখুশি, ছটফটে। কিন্তু ক্যাথি যে ঠিক তার উল্টোটাই হয়েছে!

'আমি চেষ্টা করবো মা',—আধ-ফোটা গলায় উত্তর দিল ক্যাথি।

'সারা সকালটা কোথায় গিয়ে যে বসে থাকিস, এক ফোঁটা ঘরের কাজওতো করিস না! কোথায় গেছলি—কোন চুলোয়?'

'এই, একটু বাইরেটায় গেছলুম মা'—গলাটা যেন বুজে আসছে ক্যাথির। কিন্তু ওর গলা শুনে মা অন্যরকম ভাবলেন। মেয়েটা সারা দিন কোথায় ছিল জানার জন্যে খুব কৌতূহল হল তাঁর। শুধোলেন :

'সত্যি কথা বল্, কোথায় গেছলি? বলি কথাটা কানে যাচ্ছে? তোর ঐরকম নিড়বিড়ে, পাগলাটে কাজকম্মো আমি আর বেশিদিন সহ্য করবো না, হাঁ-এই বলে দিলুম।'

মায়ের মুখে পাগলাটে শব্দটা শুনে ক্যাথির মনে পড়ে গেল, বাচ্চারা ওকে 'পাগলী-বেড়াল' বলে ডাকে। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো ও।

'আরে হলোটা কী? ভীতুর ডিম কোথাকার! সত্যি কথাটা বলতে পারছিস না, কোথায় ছিলি? নাকি বলা যাবে না, গোপন ব্যাপার, অ্যাঁ?'

এ কথার আর কী জবাব দেবে মেয়েটা, বলো! ও শুধু ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। তারপর হঠাৎ একটা চেয়ারকে উল্টে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লো ছাদের চিলে-কোঠায়। চিলে-কোঠার এক কোণে রাখা খানকয়েক থলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ওর মনটা যেন একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে।

নিচের তলায় টেবিলটা সাফ-সুতরো করতে করতে কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাথির মা। মেয়ের এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে উনি মোটেই অবাক হন না। মেয়েটা তো হামেশাই এ-রকম 'ক্ষেপে' যায়। থাক্, একলাই থাক্ মেয়েটা। বলে আর হবেটা কী? চোখের জল তো মেয়ের ঝরেই আছে! গেরস্তচাষী ঘরের বছর বারোর মেয়েরা যেমনটা হয়, এ মেয়েটাও ঠিক তেমনি হয়েছে আর কি!

ওদিকে, চিলেকোঠায় বসে, খানিকটা কেঁদে ক্যাথি অনেকটা শান্ত হলো। ধীরে-সুস্থে ভাবতে শুরু করলো ও।

এবার নিচের তলায় যাওয়া যাক্। গিয়ে মাকে বলতে হবে—বুঝলে মা, আসলে আমি না ঐ রাস্তার পাশের পাথরটার ওপরে বসে বসে এটা-সেটা ভাবছিলুম; দাও, এখন কী কাজ করতে হবে, করে দিই। তাহলে মা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে কাজ করতে ক্যাথি ডরায় না। আর মা যদি জানতে চান কেন সে সারাটা দিন বাইরে বসে ছিল, তাহলে বলবে যে খুব দরকারী একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছিল ও। তারপর সন্ধ্যেবেলায় লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যখন ও ডিম দিতে যাবে, তখন মায়ের জন্যে খুব সুন্দর, ঝকমকে একটা রূপোলী আঙুলঢাকা কিনবে

আঙ্গুলঢাকা বুঝলে তো ? ঐ যে, সেলাই করার সময় আঙ্গুলে একটা টুপির মতন লাগানো হয়, ঐটাকেই বলে আঙ্গুলঢাকা। একটা আঙ্গুলঢাকা কেনার মত পয়সা তো তখন ক্যাথির কাছে থাকবেই।

এই কাজটা করতে পারলে মা বুঝতে পারবেন যে তাঁর মেয়েটা মোটেই মাথামোটা কিম্বা খ্যাপাটে নয়! ওহ্, এই সাঙ্ঘাতিক নামটার হাত থেকে যে কবে রেহাই পাবো—ভাবলো ক্যাথি। আচ্ছা, আঙ্গুলঢাকা কেনার পর যদি কিছু পয়সা বাঁচে, তাহলে তাই দিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে নিলে তো বেশ হয়! ইস্কুলে যাওয়ার সময় মিষ্টিগুলো অন্য মেয়েদেরকে খেতে দেবে ও। তাহলে ওরা ভালবাসবে ওকে, ওদেরসঙ্গে খেলতে-টেলতেও বলবে। খেলা দেখলে মেয়েগুলো বুঝতে পারবে অন্যদের থেকে ও এমন কিছু খারাপ খেলে না। তখন নিশ্চয়ইওকে আর কেউ ক্যাথি ছাড়া অন্য নামে ডাকবে না। আহ্!

ধীরপায়ে নিচে নেমে এলো ক্যাথি। দালানে দাঁড়িয়ে আছেন মা। মা-কে দেখেই ওর সব সাহস একেবারে উবে গেলো। ঝটপট জানলাগুলো সাফ করতে শুরু করলো ও। এ কাজটা ও রোজই করে।

সূয্যি যখন ডুবু-ডুবু, তখন ক্যাথি ডিমের ঝুড়ি নিয়ে গ্রামের পথে বেচতে বেরোল। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক হেঁটে প্রথম খদ্দের পেলো ও। থালা হাতে নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মহিলা।

মিষ্টিগলায় মহিলা বললেন, 'আজ আমাকে দশখানা ডিম দিস্ রে'। দশটা ডিম গুণে দিলো ক্যাথি। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলো।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পরে ক্যাথির সবকটা ডিমই বিক্রী হয়ে গেলো। তখন ও দোকান থেকে কিনে নিলো একটা আঙ্গুলঢাকা আর কিছু মিষ্টি। তারপর টুক্‌টুক করে চলতে শুরু করলো বাড়ির দিকে। যখন আধাআধি রাস্তা এসেছে, তখন দেখলো দুটো মেয়ে ওর দিকেই আসছে। এরাই ওকে সকালে রাগাচ্ছিল। একবার ও ভাবলো—

লুকিয়ে পড়ি বাবা। কিন্তু তা ও করলো না। সোজা হেঁটে চললো। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে ওর।

'ছাখ, ছাখ, ঐ যে খ্যাপাটে বেড়ালটা আসছে'!

একেবারে হকচকিয়ে গেলো ক্যাথি। তারপর ঝুড়ি থেকে মিষ্টির বাক্সটা বার করে আস্তে করে এগিয়ে দিলো মেয়েছুটোর দিকে। ওর হাত থেকে বাক্সটা টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেলো মেয়ে ছুটো। যাবার সময় একটা মেয়ে ওর দিকে চেয়ে জিভ ভ্যাংচালো।

বুকের মধ্যেটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেলো ক্যাথির। রাস্তার পাশটাতে ঘাসের ওপর বসে কেঁদে ফেললো ও। অনেকক্ষণ ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো ওর চোখের জল। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। একসময় আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো ক্যাথি, মুছে নিলো চোখের জল, তুলে নিলো ঝুড়িটা, ধীরে ধীরে পা বাড়ালো বাড়ির দিকে।

আর সেই ঘাসের মধ্যে কোথাও পড়ে রইলো আঙুলঢাকাটা, হয়তো অন্ধকারের বুকেও সেটা ঝিক্‌মিক করে চলেছে···

ফুলওয়ালি

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

গাঁয়ের একেবারে শেষ মাথায় একটা ছোট্ট বাড়ি, প্রত্যেক দিন ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় ঐ বাড়িটার দরজা খুলে বেরিয়ে আসে একটা ছোট্ট মেয়ে। দু'হাতে ফুল-বোঝাই দুখানা ঝুড়ি। বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে ও, শুরু হয় ওর দিনের কাজ। পথে চলতে চলতে মানুষজন দেখলে ও মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ে। তারাও হাসে, আর মনে মনে ভাবে, 'আহারে, কতখানি রাস্তা, কী কঠিন কাজ। বারো বছরের একটা বাচ্চা কি এত কষ্ট সইতে পারে'।

কিন্তু গাঁয়ের লোকজনদের এইসব ভাবনার কথা ছোট্ট মেয়েটা তো আর বুঝতে পারে না। ছোট ছোট পায়ে তড়বড় করে পথ চলে ও, আরও পথ, আরও আরও পথ। শহরটা সত্যি অনেক দূরে। তা ধরো না, শহরে পৌঁছনোর জন্যে অন্তত আড়াই ঘণ্টা এক নাগাড়ে হাঁটতে হয়ই ওকে। তাও আবার দু'হাতে দুখানা ভারী ভারী ঝুড়ি নিয়ে। কাজটা মোটেই সোজা নয়।

হাঁটতে হাঁটতে শহরের রাস্তায় পৌঁছে হাঁফ ধরে যায় ওর। তখন ও ভাবে—থাকগে, খানিক পরেই তো বসা যাবে, তখনই বেশ জিরিয়ে নেবো'খন। বাজারে গিয়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত এতটুকুও থামে না ও। তারপর বাজারে বসে বিক্রির জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে।

অনেকসময় সারাটা দিনই বসে থাকতে হয়। গরীব ছোট্ট ফুলওয়ালীর থেকে ক'জন আর ফুল কিনবে বলো? মাঝে-মাঝেই দেখা যায়—আধা ভর্তি ঝুড়ি দুটো নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরছে ক্রিস্টা।

আজকের ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। বাজার আজ ভিড়ে ভিড়াক্কার, জোর কেনা-বেচা চলছে। তরকারীউলিরা চিৎকার-চেঁচামেচি করছো, হাঁক পাড়ছে—এই যে শাক, জলের দর—লেবু-লেবু, ফুরিয়ে গেলো, ফুরিয়ে গেলো!

খদ্দেররা কিন্তু ক্রিস্টার গলা প্রায় শুনতেই পাচ্ছে না, বাজারের এই হল্লা-গোল্লার মধ্যে ওর চিকন চিৎকার একেবারে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তা সে চাপাই পড়ুক আর যা-ই হোক, সারাদিন ধরেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাল ও,—'ফুল ফুল, সুন্দর সুন্দর ফুল, এক গোছা ছ'পেন্স, মাত্র ছ'পেন্স, ফুল কিনুন, ফুল'। অন্য সব কাজকম্মো মিটিয়ে অনেকেই ওর ফুলগুলো দেখলো, এক এক গোছা কিনেও নিলো অনেকে।

বেলা ঠিক বারোটার সময় বাজারের উল্টো দিকের কফির দোকানটায় গেলো ক্রিস্টা। এই দোকানদার রোজ ওকে বিনি পয়সায় খুব মিষ্টি দিয়ে এক কাপ কফি খেতে দেয়। তাই নিজের সব থেকে সুন্দর ফুলগুলো এই দোকানীকেই দিয়ে যায় ও।

কফি খেয়ে এসে নিজের জায়গায় বসে আবার হাঁকতে শুরু করলো ক্রিস্টা। বেলা সাড়ে তিনটের সময় ঝুড়ি দুটো তুলে নিয়ে গাঁয়ের দিকে হাঁটা দিলো ও! খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে ক্রিস্টা। ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত এখন ও।

গাঁয়ে ফিরতে পাক্কা তিন ঘণ্টা লেগে গেলো ওর। সাড়ে ছ'টার সময় ছোট বাড়িটার দোরগড়ায় এসে পৌঁছলো। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ঘর-দোর ঠিক যেমনটা ছিল, এখনও ঠিক তেমনটাই রয়েছে—নিষ্প্রান, ফাঁকা, এলোমেলো। এই ঘরে ও আর ওর ছোট বোন থাকে। বোন ভোর থেকে রাত্তির পর্যন্ত গ্রামে কাজ করে। ঘরে ফিরেও একটুকু ফুরসৎ নেই ক্রিস্টার। আলুগুলো ছাড়াতে হবে, শাকসব্জীগুলো ধুয়ে-মুছে সাফ করতে হবে। সাড়ে সাতটার সময় কাজ থেকে ফিরলো ওর বোন। একসঙ্গে খেতে বসলো দুজনে।

সন্ধ্যে আটটার সময় বাড়ির দরজা খুলে আবার বেরিয়ে পড়লো ছোট্ট মেয়েটা। হাতে দুখানি ঝুড়ি। বাড়ির চারপাশের মাঠের মধ্যে খুঁজতে শুরু করলো ও। বেশি দূর অবিশ্যি যেতে হলো না ওকে। ঘাসের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুল তুলতে শুরু করলো। ছোট-বড় হরেক রকম নানা রঙের ফুল। সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু। এখনও ঘাসের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে চলেছে ক্রিস্টা। কালকের জন্যে ফুল যোগাড় করে রাখতে হবে তো।

কাজ শেষ হলো একসময়। ফুলে ফুলে ঝুড়িদুটো উবু-চুবু। সূর্য গেছে হারিয়ে। মাথার পিছনে হাতদুটো পেতে ঘাসের বুকে শুয়ে পড়লো ক্রিস্টা। দু'চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকালো ও।

এইটাই ওর সারা দিনের সবথেকে প্রিয় সময়। এই ছোট্ট ফুলওয়ালি এখন বড় খুশি। সারাদিনের খাটুনির শেষে যতদিন এই মিষ্টি অবসরটুকু ও পাবে, ততদিন কোন কিছুতেই ওর দুঃখ নেই।

এই ঘাসের বুকে, ফুলেদের মাঝখানে, আঁধার-ভরা আকাশের নিচে শুয়ে ক্রিস্টা খুব সুখী। এখন ওর কোন ক্লান্তি নেই, মনে নেই বাজারের কথা, লোকজনদের কথা। ও এখন স্বপ্ন দেখছে, আর ভাবছে —আমি যেন রোজ এই অবসরটুকু পাই, আর এই সময়টুকু যেন কাটাতে পারি শুধু ঈশ্বর আর প্রকৃতির সঙ্গে।

কল্যাণময়ী দেবদূতী

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

কোন এক কালে এক বৃদ্ধা ঠাকুমা আর তার ছোট্ট নাতনী একটা বিরাট বনের পাশে বাস করতো। তারা অনেককাল ধরে ওখানে ছিলো। খুব ছোট বেলাতেই মেয়েটার বাবা মা মারা যায়। তখন থেকে ঠাকুমাই দেখাশুনো করতো ওর। ওদের ছোট্ট বাড়িটার চারপাশে আর কোন ঘর-দোর ছিলো না। কিন্তু তাতে ওদের কিছু যেতো আসতো না। দিব্যি সুখেই দিন কেটে যেতো ওদের।

একদিন সকালে ঠাকুমার শরীর খারাপ করলো, খুব ব্যথা হতে লাগলো, বিছানা ছেড়ে মোটে উঠতেই পারলেন না তিনি। নাতনীর বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। নিজের সাধ্যমত ঠাকুমার সেবাযত্ন করতে লাগলো সে। পাঁচদিন পর মারা গেলেন ঠাকুমা। মেয়েটা একেবারে একলা হয়ে পড়লো। কারুর সঙ্গে ওর চেনা-শোনাও ছিল না। ঠাকুমাকে কবর দেওয়ার জন্যে দূর গ্রাম থেকে কাউকে ডাকতেও ইচ্ছে করছিলো না ওর। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের নিচে মেয়েটা একা একটা গর্ত খুঁড়লো। তারপর তার মধ্যে শুইয়ে দিলো ঠাকুমাকে। মাটির নিচে চলে গেলেন ঠাকুমা।

ঘরে ফিরে নিজেকে খুব একলা মনে হতে লাগলো মেয়েটার। উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো সে। সারাটা দিন ঐভাবে পড়ে রইলো, শুধু একটু কিছু মুখে দেবার জন্যে একবারটি উঠলো সন্ধ্যেবেলায়। এই ভাবেই চললো দিনের পর দিন। বেচারী মেয়েটা আর কোন কিছুতেই আনন্দ পায় না, শুধু তার সেই আদরের ঠাকুমার জন্যে কেঁদেই চলে, কেঁদেই চলে।

কিন্তু একদিন এমন একটা ব্যাপার ঘটলো, যাতে ও একদিনেই একদম বদলে গেলো। সেদিন রাত্তিরে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল মেয়েটা।

হঠাৎ যেন সামনে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুমা। তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। কাঁধের নিচে লুটিয়ে পড়েছে সাদা রেশমের মতো চুলগুলো। হাতে একটা ছোট্ট প্রদীপ।

বিছানায় শুয়ে চুপ করে দেখতে লাগলো মেয়েটা। তারপর একসময় ঠাকুমা বললেন, 'খুকী রে, চার সপ্তাহ ধরে আমি দেখছি তুই শুধু কাঁদছিস আর কাঁদছিস। এ তো ভালো কথা নয়। তোকে যে কাজ করতে হবে, সুতো কাটতে হবে, আমাদের ঘর-দোর দেখাশুনো করতে হবে, ভালো করে সাজ-গোজও করতে হবে।

'তুই বুঝি ভেবেছিস আমি মরে গেছি বলে আর তোর দেখাশুনো করি না, তাই না? নারে, আমি স্বর্গ থেকে সবসময় তোর দিকে নজর রাখি। আমিই এখন তোর কল্যাণময়ী দেবদূতী। আগের মতন এখনও আমি সারাক্ষণ তোর সঙ্গে সঙ্গেই থাকি, বুঝলি! কাজকম্মো শুরু কর খুকি। মনে রাখিস, ঠাকুমা সবসময় তোর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে।

এইকথা বলে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন ঠাকুমা। মেয়েটা আবার ঢলে পড়লো গভীর ঘুমে।

পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঠাকুমার কথাগুলো মনে পড়ে গেলো খুকির। খুশিতে নেচে উঠলো ও, আর নিজেকে একলা বলে মনে হলো না। আবার কাজকর্ম শুরু করলো ও। সারাদিন ধরে সুতো কেটে বাজারে বিক্রি করে আসতে লাগলো। সবসময় ঠাকুমার উপদেশ মেনে চলতো ও।

তার অনেকদিন পরের কথা যদি জানতে চাও, তাহলে বলি—বাইরের জগতে এসেও মোটেই একলা থাকতে হয় নি ওকে। একজন চমৎকার ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওর। ভদ্রলোকের নিজেই একটা জাঁতাকল ছিলো। ঠাকুমার উদ্দেশে ও বলতো—ঠাকুমা গো ভাগ্যিস আমাকে একলাটি ফেলে চলে যাওনি তুমি! আর আমি জানি, এখন আমার একজন খুব ভালো সঙ্গী থাকলেও তুমি কোনদিনই আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না, তাই না ঠাকুমা!

ভয়

২৫শে মার্চ, ১৯৪৪

এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলুম আমি। চারিদিকে যুদ্ধের উন্মত্ততা। জীবন একেবারে অনিশ্চিত, এক ঘণ্টা পরে কী হবে কেউ জানে না। আমরা, মানে আমার মা-বাবা, ভাই-বোনেরা আর আমি শহরে থাকতুম। সারাক্ষণই আমরা ভাবতুম—এখান থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নিলে কিম্বা কোথাও চলে যেতে পারলে বাঁচা যায়। সারাদিন কামান আর রাইফেলের একটানা গর্জন, আর রাত্তিরবেলা যেন কোন অজানা গহ্বর থেকে ছিটকে উঠতো রহস্যময় সব অগ্নিকণা এবং আচমকা এক একটা বিস্ফোরণ।

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সেই মরণ-মাখা দিনগুলোর কথা আমার ঠিক-ঠিক মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে সারাটা দিন আমার ওপর চেপে বসে থাকতো একটা আতঙ্ক। আমার মা-বাবা নানারকম ভাবে আমাকে প্রবোধ দেওয়ার দেওয়ার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাতে কোন লাভ হতো না! আমার মন-প্রাণ জুড়ে ঘুরে বেড়াতো একটাই অনুভূতি—আতঙ্ক। খেতে পারতুম না, পারতুম না ঘুমোতে। আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করে ফেলেছিল পুরোপুরিভাবে। প্রায় সাতদিন এইরকই অবস্থায় ছিলুম আমি। তারপর সেই একটা সন্ধ্যে আর রাত। আহ্, ঠিক যেন গতকালের কথা!

সন্ধ্যে সাড়ে আটটা। গোলা-গুলির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। একটা সোফার ওপর ঝিম্‌ধরা অবস্থায় পড়েছিলুম আমি। এমন

সময় আচমকা দুটো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো। চমকে উঠলুম আমরা সবাই। থরথর করে কাঁপছি আমরা, তবু পড়ি-মরি করে সবাই ছুটে গেলুম হল্‌ঘরটার দিকে। মা এমনিতে খুব ধীর-স্থির, কিন্তু তাঁকেও তখন কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ভেসে আসতে লাগলো এক একটা বিস্ফোরণের শব্দ। তারপর···তারপর একটা বীভৎস আওয়াজ, যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কাঁচের জিনিস, আর তার সঙ্গে আর্তনাদ ও গোঙানীর কান-কাটানো ঐক্যতান। চটপট খান কয়েক মোটা-মোটা জামা পরে নিলুম গায়ে, একটা ঝোলায় ভরে নিলুম কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসপত্র, তারপর ছুটে বেরোলুম বাড়ি থেকে। যত জোরে পারি ছুটতে লাগলুম, সর্বনাশা আগুনের বেড়াজাল থেকে বেরোনর জন্যে তখন আমি মরিয়া। সর্বত্রই লোকের চিৎকার, চেঁচামেচি। দিশেহারার মতো ছুটোছুটি করছে সবাই। রাস্তাগুলো একটা ভয়ঙ্কর লাল আভায় ঝকঝক করছে।

মা-বাবা, ভাই-বোন কারুর কথাই তখন মনে ছিল না আমার। আমি শুধু নিজের কথাই ভাবছিলুম। একটাই চিন্তা ঘুরছিলো মাথায়—পালাতে হবে—পালাতে হবে—পালাতে হবে! এতটুকু ক্লান্ত লাগেনি আমার, আতঙ্কে তখন আমি আচ্ছন্ন। ঝোলাটা যে কখন হারিয়ে গেছে, সে খেয়ালও নেই। মাথায় তখন শুধু দৌড়নোর ভাবনা।

সার সার জ্বলন্ত বাড়ি, মরিয়া মানুষজন আর তাদের বিকৃত মুখগুলোর পাশ দিয়ে দিয়ে কতক্ষণ যে দৌড়েছিলুম, মনে নেই। একসময় যেন মনে হলো—আশপাশটা বেশ শান্ত লাগছে। চোখ মেলে দেখলুম চারদিকটা। আহ্‌, যেন বেরিয়ে এলুম কোন দুঃস্বপ্নের জাল কেটে। দেখলুম, আমার চারপাশে আর কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। আগুন নেই, বোমা নেই, মানুষজন কিচ্ছু নেই। এ কোথায় এলুম আমি? ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলুম। ওঃ হো, এ যে একটা

মস্ত তৃণভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি! মাথার ওপরে আকাশের চাঁদোয়া, তার শরীরে তারাদের চিক্‌মিক আর চাঁদের ঝিল্‌মিল। চমৎকার আবহাওয়া। মন-প্রাণ শীতল করে দেয়, কিন্তু মোটেই ঠাণ্ডা নয়।

চারপাশে কোন শব্দ নেই। ক্লান্ত শরীরে ঘাসের ওপর বসে পড়লুম আমি। কাঁধে যে কম্বলটা ছিল, সেটা বিছিয়ে দিলুম ঘেসো জমিতে। তারপর শুয়ে পড়লুম টানটান হয়ে।

আকাশের দিকে তাকালুম। আর তখনই বুঝতে পারলুম—আমার মধ্যে এখন আর কোন আতঙ্ক নেই যেন। বরং মনের মধ্যে কেমন যেন এক শান্তিময় অনুভূতি। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ির কথা আমার একবারও মনে পড়ে নি। শুধু মনে হয়েছে—বিশ্রাম, একটু বিশ্রাম চাই আমার। কিছুক্ষণের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লুম আমি। ঘুমিয়ে পড়লুম ঘাসের ওপরে, আকাশের ছায়াতলে।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন পূর্ব আকাশে সবেমাত্র চোখ মেলছে সূর্যটা। মনে পড়লো, আমি কোথায়। শহরের প্রান্তবর্তী বাড়িগুলো চিনতে পারলুম দিনের আলোয়। চোখ রগড়ে চারদিকটা ভালো করে দেখলুম। কেউ কোথাও নেই। আমার সঙ্গী শুধু ঘাসের বুকে ফুটে থাকা কিছু কালকাসুন্দি ফুল আর ত্রিপত্রলতা। কম্বলে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করলুম—এখন কী করা যায়? কিন্তু ঠিক গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারলুম না, ভাবনাটা এলোমেলো হয়ে গেলো। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো রাত্তিরের সেই আশ্চর্য অনুভূতিটা, যখন ঘাসের ওপরে বসে আমার মন থেকে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল সবটুকু আতঙ্ক।

পরে আমি খুঁজে পেয়েছিলুম আমার মা-বাবাকে। অন্য একটা শহরে চলে এসেছিলুম আমরা। অবসান ঘটেছে যুদ্ধের। এখন আমি জানি, সেই বিশাল, বিস্তৃত আকাশের নিচে বসে কেন সমাপ্তি ঘটেছিলো আমার আতঙ্কের। সীমাহীন প্রকৃতির মাঝে একলাটি

বসে ছিলুম আমি। আর তারই মাঝে বুঝতে পেরেছিলুম (যদিও তখন কারণটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি নি) যে ভয় বা আতঙ্ক হচ্ছে আসলে একটা ব্যাধি, এবং যার একটাই মাত্র প্রতিকার আছে। কেউ যদি কখনো আমার মতো ভয় পায়, তাহলে তাকে আমি বলবো —প্রকৃতির দিকে তাকাও, দেখবে মানুষ যতোটা ভাবে তার চেয়ে অনেক কাছেই ঈশ্বরের বসবাস।

তারপর থেকে আমি আর কোন কিছুতেই ভয় পাই না, আতঙ্কিত হই না, আশপাশে লক্ষ বোমার উন্মত্ত হুঙ্কারেও নয়।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ বামনটি

১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৪

একসময় একটা ছোট্ট মেয়ে ছিলো, বুঝলে। তার নাম ছিলো ডোরা। খুব সুন্দর, ছটফটে মেয়ে ছিলো এই ডোরা। ওরা ছিলো খুব বড়লোক। মা-বাবার প্রশ্রয়ে একেবারে বখে গেছলো মেয়েটা। সারাক্ষণ শুধু খিলখিল করে হাসতো। ভোরবেলা থেকে শুরু করে সেই রাত্তির পর্যন্ত এক নাগাড়ে হাসতো ও। সব ব্যাপারেই ওর আমোদ, দুঃখ-টুঃখ বলে কিছুই ছিলো না।

যে বনটার মধ্যে ডোরাদের ঘর, সেই বনেই বাস করতো একটা বামন। নাম তার পেল্‌ড্রন। এই পেল্‌ড্রন ছিলো সব ব্যাপারে ডোরার ঠিক উল্টোটা। চারিদিকের সৌন্দর্য আর শুভর ছোঁয়ায় হাসিতে উপ্‌ছে উঠতো ডোরা, আর পৃথিবীর দুর্দশার কথা ভেবে, বিশেষ করে বামনদের জগৎটার দুর্দশার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ভরে উঠতো পেল্‌ড্রনের মনটা।

এই বামনদের গ্রামে থাকতো একজন মুচি। তা, একদিন বুঝলে, ডোরাকে একটা দরকারে যেতে হলো সেই মুচির কাছে। তখন কী ঘটলো বলো তো? সেই বিরক্তিকর, লম্বা-মুখো পেল্‌ড্রনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলো ডোরার। ডোরা মেয়েটা খুব মিষ্টি, তা সত্যি। কিন্তু সব্বাই ওকে ভালবাসতো বলে ও মধ্যে খানিকটা অহংকারও ছিলো। পেল্‌ড্রনকে দেখতে পেয়েই ছুটে গেলো ডোরা, ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো ওর মাথার টুপিখানা, তারপর কিছুটা দূরে যেয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে হাসতে লাগলো খিলখিল করে।

মেজাজ চড়ে গেলো পেল্‌ড্রনের। মাটিতে পা ঠুকে ও বললো, 'দাও, এক্ষুনি ফিরিয়ে দাও আমার টুপিটা'।

কিন্তু ডোরা কি আর সে কথা শোনার পাত্রী ? ও সোজা ছুট লাগালো, তারপর টুপিখানা লুকিয়ে রাখলো একটা গাছের কোটরে। সেখান থেকে তড়বড় করে আবার ফিরে চললো সেই মুচির কাছে।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর, টুপিটা খুঁজে পেলো পেল্‌ড্রন। এ-সব মস্করা ও মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। আর ডোরা করলে তো কথাই নেই, এই হাসকুটি মেয়েটাকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। উদাসভাবে হাঁটতে লাগলো ও। হঠাৎ একটা গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনে চমক ভাঙলো ওর। গলাটা বলছে :

'পেল্‌ড্রন, আমি এই পৃথিবীর সবথেকে বুড়ো বামন, আর বামনদের মধ্যে আমিই সব থেকে গরীব। দয়া করে আমাকে যা হোক কিছু দাও, একটু খাবার কিনবো আমি'।

মাথা নেড়ে পেল্‌ড্রন বললো, 'না, তোমাকে আমি কিচ্ছুই দেবো না। পৃথিবীতে এত দুঃখ-দুর্দশা সয়ে আর কী হবে ? তোমার তো এখন মরাই ভালো'। এই কথা বলে হন্‌হন করে চলে গেলো সে, একবার পিছন ফিরেও তাকালো না।

এদিকে ডোরা তখন ফিরছিলো মুচির বাড়ি থেকে। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হলো বৃদ্ধ বামনটির। ওর কাছেও ভিক্ষা চাইলো বামনটি। ডোরাও অবশ্য তাকে ভিক্ষা দিলো না, কিন্তু ও একেবারে অন্য কারণ দেখালো।

ডোরা বললো, 'না, আমি তোমাকে পয়সা-কড়ি দেবো না। তুমি যদি গরীব হও, তাহলে তার জন্যে তুমি নিজেই দায়ী। এই পৃথিবীটা খুব সুন্দর, এখানে এসে গরীবদের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি মোটেই রাজি নই'। এই বলে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেলো ডোরা।

বৃদ্ধ বামনটির বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। শ্যাওলা-ধরা একটা জায়গায় বসে পড়ে ভাবতে লাগলো—এই দুজনকে নিয়ে কী করা যায় ? একজন সবসময় দুঃখে ভরপুর, আরেকজন

আনন্দে উচ্ছল। কিন্তু এভাবে তো ওরা কেউই জীবনের পথে বেশি দূর এগোতে পারবে না।

এই বুড়ো বামনটি কিন্তু কোন সাধারণ বামন নয়, বুঝলে তো! সে ছিলো আসলে একজন জাদুকর। তবে এই জাদুকে সে কখনও খারাপ কাজে লাগাতো না। বরং সে সবসময় চেষ্টা করতো মানুষের উপকার করতে, বামনদের ভালো করতে, আর পৃথিবীটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

ঐখানে বসে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে ভাবলো বৃদ্ধ বামনটি। তারপর উঠে পড়ে ঠকঠক করে হাঁটতে লাগলো ডোরাদের বাড়ির দিকে।

পরেরদিন দেখা গেলো—একটা ছোট ঘরের মধ্যে আটকা পড়েছে ডোরা আর পেল্‌ড্রন। ঠিকমতো শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে বৃদ্ধ বামনটি। এই মহান জাদুকরের কথার মধ্যে এমন একটা আদেশের সুর ছিলো যে, তাকে অমান্য করার সাহস ডোরা ও পেল্‌ড্রনের মা-বাবাদেরও ছিলো না।

কুটিরের মধ্যে কী করছিলো ওরা দুজন? ওদেরকে বাইরে যেতে মানা করে দেওয়া হয়েছিলো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করাও নিষেধ ছিলো। সারাটা দিন ওদেরকে কাজ করতে হতো, বুঝলে। বৃদ্ধ বামনটি এইরকম আদেশই দিয়েছিলো ওদেরকে। ডোরা কাজ-কর্ম করতো, ঠাট্টা-তামাশা করতো, আর হাসতো। পেল্‌ড্রনও কাজ করতো, আর মন-মরা, দুঃখী হয়ে থাকতো।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যে সাতটার সময় বুড়ো বামনটি ওদের কাজকর্ম যাচাই করতে আসতো, তারপর আবার চলে যেতো। ওরা দুজন বসে বসে ভাবতো—কি করে এখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? উদ্ধার পাওয়ার অবিশ্যি একটাই উপায় ছিলো—বুড়ো বামনটির সবকথা মেনে চলা।

সারাটা দিন ধরে শুধু ঐ লম্বা-মুখো পেল্‌ড্রনের মুখ দেখাটা ডোরার পক্ষে কত সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, ভাবতে পারছো? সকালে, দুপুরে,

বিকেলে, সন্ধ্যেয়, রাত্তিরে—শুধু পেল্‌ড্রন আর পেল্‌ড্রন, আর কেউ কোথাও নেই। তবে কিনা পেল্‌ড্রনের সঙ্গে কথা-টথা বলার তো আর সময় ছিলো না ডোরার। ওকে রান্না করতে হতো (মায়ের কাছ থেকে রান্না করতে শিখেছিলো ও), ঘর-দোর সাফ-সুতরো করা, সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখা, সবই করতে হতো। আর 'ফুরসৎ-টুরসৎ' পেলে একটু-আধটু সুতোও কাটতে হতো ওকে।

আর পেল্‌ড্রন? সে ঐ ঘেরা বাগানে কাঠ কাটতো, জমি চষতো, তার ওপর ওকে আবার জুতোও বানাতে হতো। সন্ধ্যে সাতটা বাজলে ডোরা ওকে খেতে ডাকতো। তখন ওরা দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়তো। বৃদ্ধ বামনটি যখন আসতো, তখন তার সঙ্গে কথা বলার শক্তিটুকুও যেন থাকতো না ওদের।

এক সপ্তাহ ধরে চললো এইরকম। ডোরা তখনও হাসতো, কিন্তু সেই সঙ্গেই ও বুঝতে শিখছিলো যে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে। ও বুঝতে শিখছিলো যে মানুষকে অনেক সময়ই খুব কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়, আর তখন তাদেরকে কড়া কড়া কথা বলে ভাগিয়ে না দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোটাই অন্য মানুষদের উচিত। পেল্‌ড্রনও আর ঠিক আগের মতো অতটা মন-মরা ছিলো না। কাজ করতে করতে কখনো-সখনো শিস্‌ দিয়ে উঠতো, কখনো আবার ডোরাকে হাসতে দেখলে ও-ও দাঁত বার করে হাসতো।

রবিবার দিন বৃদ্ধ বামনটি ওদের দুজনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো বামনদের গ্রামের গির্জায়। যাজকদের কথা ওরা আগে তেমন মন দিয়ে শুনতো না। এখন কিন্তু ওরা দুজনেই একমনে শুনলো বামন-যাজকের কথাগুলো। ছায়া-ঢাকা বনপথে হাঁটার সময় ওদেরকে বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিলো।

বৃদ্ধ বামনটি তখন বললো, 'তোমরা তো দেখছি খুব ভালো হয়ে আছো। তা বেশ, আজকের দিনটা তোমরা আগের মতোই বাইরে থাকতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, কাল থেকে আবার কাজ শুরু

করতে হবে। আর হ্যাঁ, তা বলে আজকে তোমরা ফিরে বাড়িতে যেতে পারবে না, কিম্বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে না'।

ওরা কেউই সুযোগ পেয়ে পালানোর কথা ভাবলো না। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা পেয়ে ওরা মহা খুশি, হলোই বা একদিনের জন্যে। সারাটা দিন ওরা খেলা করলো, আমোদ করলো, দেখে বেড়ালো হরেক রকমের পাখি, ফুল আর নীল রঙে স্নান করা আকাশ, আর উষ্ণ রোদ্দুর গায়ে মেখে হয়ে উঠলো তরতাজা। সন্ধ্যেবেলায় ওরা খুশি মনে ফিরে এলো সেই ছোট্ট ঘরে, সারারাত আরাম করে ঘুমোলো, তারপর সকালে উঠে যে যার কাজ শুরু করে দিলো।

টানা চারটে মাস ধরে চললো এইরকম। প্রত্যেক রবিবার ওরা গির্জায় যেতো, সারাটা দিন ঘুরে বেড়াতো খোলা আকাশের নিচে, আবার সপ্তাহের বাকি দিনগুলো হাড়-ভাঙা খাটনি খাটতো।

তারপর কী হলো জানো? একদিন সন্ধ্যেবেলায় বৃদ্ধ বামনটি ওদের দুজনকার হাত ধরে বনের পথে হাঁটিতে শুরু করলো।

চলতে চলতে বৃদ্ধ বামনটি বললো, 'বুঝলে বাছারা, আমি জানি, মাঝে-মাঝে আমার ওপর তোমাদের খুবই রাগ-টাগ হয়েছে। তা, তোমরা দুজনেই তো এবার বাড়ি ফিরতে চাও, না কি'?

ডোরা বললো, 'হ্যাঁ, চাই'। পেলড্রনও বললো, 'হ্যাঁ, চাই'।

'বেশ। কিন্তু তোমরা কি বুঝতে পেরেছো যে যা কিছু করা হলো, তা তোমাদের ভালোর জন্যেই করা হয়েছে'!

না, তা তো ওরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি।

'তাহলে শোনো বলি,' বললো বৃদ্ধ বামনটি। 'তোমাদের দুজনকে নিয়ে এসে কেন এইখানে একসঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম, জানো? যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে তোমাদের নিজের নিজের মজা আর বিষণ্ণতা ছাড়াও জগতে আরও অনেক কিছুই আছে। এবার থেকে তোমরা জীবনের পথে অনেক ভালোভাবে চলতে পারবে। ডোরা রানী

এখন আগের চেয়ে অনেকটা রাশভারী হয়ে উঠেছো, আর পেলড্রেন বাহাদুর হয়ে উঠেছো বেশ হাসি-খুশি। আসলে একসঙ্গে থাকার জন্যে তোমাদের দুজনকেই সাধ্যমতো মানিয়ে-গুনিয়ে চলতে হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে, বুঝলে! আর আমার তো মনে হয় এখন তোমরা দুজন দুজনকে বেশ ভালোই বাসো, তাই না? তুমি কী বলো, পেলড্রেন'?

পেলড্রেন বললো, 'হ্যাঁ, এখন ডোরাকে আমার বেশ ভালোই লাগে'।

বৃদ্ধ বামনটি বললো, 'খুব ভালো। আচ্ছা শোনো, এবার তোমরা নিজের নিজের মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে পারো। কিন্তু এখানের এই দিনগুলোর কথা কখনো যেন ভুলে যেয়ো না। জীবনের সব সুন্দর জিনিসগুলো প্রাণভরে উপভোগ করো, কিন্তু সবসময় অন্যদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও মনে রেখো, তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা কোরো। সব মানুষ, সব শিশুরা আর বামনরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে, বুঝলে।

'তাহলে এবার তোমরা নিজের নিজের পথে এগিয়ে চলো, আমার সঙ্গে আর বসে থেকো না। তোমাদের ভালোর জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য, তা আমি করেছি। আচ্ছা, বিদায় বাছারা, আবার দেখা হবে'।

ডোরা আর পেলড্রেনও বললো, 'বিদায়'।

তারপর ওরা ফিরে চললো যে যার বাড়ির দিকে।

আবার একটা ছায়া-ভরা জায়গায় গিয়ে বসলো বৃদ্ধ বামনটি। ওর মনে শুধু একটাই ইচ্ছে—এই দুটো ছেলে-মেয়ের মতো পৃথিবীর সব ছেলে-মেয়েকে জীবনের ঠিক-ঠিক পথটা চিনিয়ে দেওয়া।

ডোরা আর পেলড্রেন কিন্তু জীবনে সত্যি সত্যিই খুব সুখী হতে পেরেছিলো। চিরদিনের জন্যে ওরা শিখে নিয়েছিলো যে মানুষকে যেমন সময়ে হাসতে হয়, তেমন সময়ে কাঁদতেও হয়। তারপর

অনেক, অনেকদিন পরে, যখন ওরা বড়ো হয়ে উঠলো, তখন ওরা নিজেদের ইচ্ছেতেই একটা ছোট্ট বাড়িতে বাস করতে শুরু করলো। ডোরা করতো ঘরের কাজ আর পেলড্রন করতো বাইরের কাজ—ঠিক ওদের সেই ছোটবেলার দিনগুলোর মতন।

আবিষ্কারক ব্লারি

২৩ এপ্রিল, ১৯৪৪

ব্লারি হচ্ছে একটা ভালুক। খুব ছোট বেলায় একবার ওর মায়ের অতিরিক্ত যত্ন-আত্তির বেড়া কেটে পালিয়ে গিয়ে এই বিশাল, প্রকাণ্ড জগৎটাকে নিজের চোখে ভালো করে দেখার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিলো ভালুকটার। তারপর কি হলো শোনো।

সারাক্ষণ এই ভাবনাটা নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লো ও যে দিন কয়েক ঠিকমতো খেলাধুলো পর্যন্ত করতে পারল না। চতুর্থ দিন সন্ধ্যেবেলায় ও একেবারে তৈরী হয়ে পড়লো। ছক সাজিয়ে ফেললো ও, এখন শুধু কাজে নামার ওয়াস্তা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পা টিপে টিপে চলে যেতে হবে বাগানে, যাতে ওর ক্ষুদে দিদিমণি মিমি টের না পায়। তারপর বেড়ার ফাঁক গলে ওপারে। আহ্, সামনে তখন এক অজানা জগৎ! করলোও বটে, সব কাজগুলো ঠিক ঠিক করে ফেললো ব্লারি। ও চলে যাবার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে সবাই জানতে পারল যে ব্লারি পালিয়েছে।

বেড়ার ফাঁক গলে ব্লারি যখন বাইরে বেরোল, তখন ওর সারা গা মাটি আর কাদায় মাখামাখি। কিন্তু অনেক কিছু আবিষ্কারের নেশায় যে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছে, তার কাছে ওটুকু আর এমন কী ব্যাপার? চারদিক এবড়ো-খেবড়ো খোয়া-পাথর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনেটা একবার দেখে নিলো ও, তারপর বাগানের ফুল-ছাওয়া গলিপথ দিয়ে এগিয়ে চললো বড় রাস্তার দিকে।

ওরে ব্বাবা, রাস্তায় যে মেলাই তাবড় তাবড় লোকজন ঘুরছে! একটু ঘাবড়ে গেলো ব্লারি। লোকজনের ভীড়ে ওকে তখন আর

দেখাই যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবলো ও, 'না বাবা, আমি বরং ফুটপাথের পাশটাতে সরে যাই। নাহলে তো এরা দেখছি আমাকে পিষেই মেরে ফেলবে'। এইটাই ছিলো সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ। তা, ব্লারি যে বুদ্ধিমান ছিলো, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? বুদ্ধিমান না হলে কি কেউ এত ছোট বয়সে দুনিয়া দেখতে বেরোতে পারে?

ফুটপাথের একেবারে ধারটাতে গিয়ে দাঁড়ালো ও। কে জানে বাবা, কে কখন হুম্‌দো পা ফেলে মাড়িয়ে দেবে, বলা তো যায় না। হঠাৎই ওর বুকটা ঢিব্‌ ঢিব্‌ করে উঠলো, যেন একটা মস্ত হাতুরীর ঘা পড়ছে ওর বুকের মধ্যে—ওটা আবার কী? ওর পায়ের ঠিক সামনে একখানা বিশাল কালো ফোঁকর! আসলে ওটা হচ্ছে একধরণের মদের দোকানে ঢুকবার দরজা। কিন্তু ব্লারি তো আর অ-তশত জানতো না। ওর মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করতে লাগলো। ঐ ফোঁকরটার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে নাকি? ভয়-পাওয়া চোখে চারপাশে তাকালো ও। কিন্তু চারদিকে শুধু প্যাণ্ট-পরা লোকেদের আর স্কার্ট-পরা মহিলাদের পা। ঐ গর্তটার আশপাশ দিয়ে নিশ্চিন্তে হাঁটছে সবাই, যেন ওটা কোন ব্যাপারই নয়। চারপাশের লোকজনের দেখাদেখি ভয়ে ভয়ে পা বাড়ালো ব্লারি, টুকটুক করে হাঁটতে লাগলো। খানিক পরে আবার সাহস ফিরে পেলো ও।

ভাবতে ভাবতে চললো ব্লারি, 'তাহলে এখন আমি বিরাট জগতের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, অ্যাঁ? কিন্তু, জগৎ কোথায়? যে দিকে চাই, শুধু প্যাণ্টলুন, স্কার্ট আর মোজারই তো ছড়াছড়ি! জগৎটাকে তো মোটে দেখতেই পাচ্ছি না। আসলে আমি বোধহয় জগৎটাকে আবিষ্কার করার পক্ষে বড়ই ছোট, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? রোজ রোজ ঠিকমতো পরিজ আর কড্‌-লিভার তেল খেলে (ব্যাপারটা ভাবতেই বুকটা যেন কেঁপে উঠলো ওর) আমিও আর সব্বাইকার মতন বড় হয়ে উঠবো। এখন তো বলা যাক, একদিন আমি ঠিকই জগৎটাকে দেখতে পাবো'।

চারপাশের সব রোগা-মোটা, লম্বা-বেঁটে পাগুলোর পরোয়া না করে গুটুর-গুটুর পায়ে এগিয়ে চললো ও। তবে এইভাবে কাঁহাতক আর হাঁটা যায় বলো! ব্লারির বেশ খিদে-খিদে পাচ্ছে, একটু যেন অন্ধকারও নামছে। খাওয়া কিম্বা ঘুমোনো নিয়ে ব্লারি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। আরে বাবা, সামনে এখন কত বড় কাজ, চোখে আশ্চর্য আবিষ্কারের স্বপ্ন। সেখানে খাওয়া-শোওয়ার মতন ঐসব ছেঁদো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোটা কি কোন কাজের কথা হলো!

বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে আবার এগোল ব্লারি। বাহ্, এ যে একটা দরজা গো! চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পা ঘষলো ও। তারপর ধীরে-সুস্থে পা বাড়াল ভেতরে। নাহ্, বরাত বলতে হবে ওর। আরেকটা দরজা টপকেই ও দেখতে পেলো—খানকয়েক চেয়ারের পায়ার মধ্যিখানে পাতা রয়েছে দু'খানা পিরিচ। একটা পিরিচ ঘন দুধে ভর্তি, আর একখানায় চমৎকার গন্ধওয়ালা সব খাবার-টাবার রয়েছে। খিদেয় তো ব্লারির ভেতরটা টাস্-টাস্ করছিল একেবারে। চোঁ-চোঁ করে একচুমুকে সবটুকু দুধ খেয়ে ফেললো ও। তারপর অন্য পিরিচের খাবারগুলো সাফ করলো বেশ চেটে-পুটে। আহ্, পরানটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো গো!

কিন্তু, কিন্তু....ওটা কী? সাদা মতন কি একটা প্রাণী, সবুজ সবুজ চোখ। প্রাণীটা যে আস্তে আস্তে ব্লারির দিকেই এগিয়ে আসছে! তারপর, ব্লারির ঠিক সামনে এসে প্রাণীটা দাঁড়িয়ে পড়ে কেমন এক অদ্ভুত গলায় শুধোল :

'এই কে তুমি? আমার খাবারগুলো সব খেয়ে ফেললে কেন'?

'আমি? আমি হচ্ছি ব্লারি। আমি অনেককিছু আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি। তা, এরকমভাবে বেরোলে রাস্তায় খিদে তো পাবেই। তবে আমি কিন্তু জানতুম না যে খাবারগুলো তোমার, সত্যি বলছি'।

'ও, তুমি তাহলে আবিষ্কার করতে পথে বেরিয়েছো! তা

দুনিয়াভোর এত মালপত্র থাকতে আমার পিরিচগুলোই ঠিক তোমার নজরে পড়লো কি করে' ?

'কারণ রাস্তায় আর কোন পিরিচ-টিরিচ আমি দেখতে পাইনি'— ব্লারির কথায় একটু তেতো-তেতো ভাব। তারপর একটু চিন্তা করে নিয়ে গলাটা কোমল করে ও শুধোল :

'তা, তোমার নামটা কী গো ? তুমি কোন্ জাতের প্রাণী' ?

'আমার নাম মুরিয়েল, আমি হচ্ছি অ্যাঙ্গোরা জাতের বেড়াল। আমার অনেক দাম, বুঝলে ! মানে আমার দিদিমনি তাই বলেন। কিন্তু, কি জানো ব্লারি, আমার কোন সঙ্গী-সাথী নেই। সবসময় একা-একা থাকতে হয়। হাঁপিয়ে উঠি যেন। তুমি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ থাকো না এখানে' !

'তা বেশ, এইখানেই না হয় আজ বিশ্রাম নেবো আর ঘুমুবো'— এমনভাবে কথা বললো ব্লারি, যেন মুরিয়েলের খুবই উপকার করছে ও। শুধুমাত্র আজ রাত্রিরটা, 'কালকেই কিন্তু আমাকে চলে যেতে হবে। আমাকে তো জগৎটাকে আবিষ্কার করতে হবে, নাকি' ?

শুনে তো মুরিয়েল নামে বেরালীটা মহাখুশি।

ও বললো, 'আচ্ছা, তাহলে এসো আমার সঙ্গে'। ওর পিছু পিছু আরেকটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো ব্লারি। ঘরটাতেও শুধু হরেক রকম কাঠের পায়া চোখে পড়ছে। তবে এ ছাড়াও ঘরটাতে আর একটা জিনিস রয়েছে, এক কোণে একখানা মস্ত বেতের ঝুড়ি, আর তার মধ্যে সবুজ রেশমে মোড়া একখানা বালিশ। মুরিয়েল তো নোংরা পায়েই বালিশটার ওপরে লাফ দিয়ে উঠলো। কিন্তু ঐভাবে জিনিসপত্র ময়লা করাটা ব্লারির তেমন মনঃপূত হলো না। ও বললো, 'আচ্ছা মুরিয়েল, আগে একটু হাত-পা ধুয়ে নিলে হতো না' ? মুরিয়েল বললো, আরে দাঁড়াও, 'যেরকমভাবে নিজেকে সাফ-সুতরো করি, সেরকমভাবে তোমাকেও আমি সাফ-সুফ করে দিচ্ছি'। সেটা যে কেমন পদ্ধতি, ব্লারির সেটা মোটেই জানা ছিলো না। জানা থাকলে ও কক্ষণো রাজি হতো না।

বেড়ালটা ব্লারিকে উঠে দাঁড়াতে বললো। উঠে দাঁড়ালো ব্লারি। তখন মুরিয়েল আস্তে আস্তে ওর ছোট্ট জিভটা বুলোতে লাগলো ব্লারির নোংরা কাদামাখা পায়ের ওপর। সারা শরীরটা কেঁপে উঠলো ব্লারির। ও শুধোল, 'এইভাবেই কি তুমি নিজেকে বা অন্যকে সাফ করো নাকি' ?

বেড়ালটা বললো, 'তা-ই তো করি। ছাখো না, তোমার শরীরটা একেবারে চকচকে করে দোবো। ঝকঝকে চেহারার ভালুকরা সব জায়গায় যেতে পারে, আর তাহলে তো তোমার পৃথিবী আবিষ্কার করাটাও অনেক সহজ হয়ে যাবে, তাই না' ? এই কথা শুনে ব্লারি নিজের কাঁপুনি সামলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, আর একবারও গাঁই-গুঁই করলো না। খুব সাহসী ভালুক ও, কী বলো ? ঘণ্টাখানেক ধরে চললো মুরিয়েলের সাফ-সাফাই। একটু অধৈর্য হয়ে উঠলো ব্লারি। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পাগুলো ওর কনকন করতে শুরু করেছে। কিন্তু শেষমেষ ওর সারা শরীরটা চকচকে হয়ে উঠলো। মুরিয়েল তখন ফের উঠে পড়লো ঝুড়িটার মধ্যে। ওর দেখাদেখি ক্লান্ত ব্লারিও শুয়ে পড়লো বালিশটার ওপরে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো ওরা।

পরেরদিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙলো ব্লারির। প্রথমটায় ও ভাবলো—এ আমি কোথায়? তারপর মনে পড়লো সব। পাশেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে মুরিয়েল। এদিকে ব্লারির তখন চন্‌মনে খিদে। আশ্রয়দাত্রী মুরিয়েল ঘুমোচ্ছে, তার ঘুম ভাঙানো কি উচিত ? কিন্তু অতশত ভাবার সময় কোথায় ব্লারির ! মুরিয়েলের গায়ে ঠেলা দিতে দিতে হুকুম করলো ও।

'আরে ওঠো, ওঠো। কতো আর ঘুমুবে ! উঠে পড়ে খেতে দাও কিছু। বেজায় খিদে পেয়ে গেছে আমার'।

বেড়ালটা প্রথমে বড় করে একটা হাই তুললো, বার দুয়েক আড়মোড়া ভাঙলো, তারপর বললো,—

'না না, আর কিছু হবে-টবে না। আমার মনিবানী তোমাকে দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। যাও যাও, ঐ বাগানটার মধ্যে এইবেলা কেটে পড়ো দেখি'।

এই না বলে ঝুড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো মুরিয়েল। তারপর ব্লারিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলো এ-দরজা সে-দরজা টপকে। শেষকালে একটা কাঁচের দরজা পেরিয়ে ওরা এসে পড়লো বাগানে। মুরিয়েল বললো, 'তোমার যাত্রা শুভ হোক ব্লারি। আচ্ছা, আবার দেখা হবে, বিদায়'—এইটুকু বলেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো ও।

আবার একলা হয়ে পড়লো ব্লারি। এখন আর নিজেকে খুব একটা চালাক-চতুর বলে মনে হচ্ছে না ওর। বাগানের মধ্যে দিয়ে টুকটুক করে হেঁটে চললো ও। তারপর বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে এসে পড়লো বাইরে। এখন কোথায় যাওয়া যায়? পৃথিবীটাকে আবিষ্কার করতে আর কত সময় লাগবে? ভেবে-চিন্তে কোন থৈ পেলো না ও। ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো ও। হঠাৎ চারপেয়ে কী একটা জন্তু গর্জন করতে করতে তীরের মত ধেয়ে এলো ওর দিকে। কী প্রচণ্ড আওয়াজ তার! কানে যেন তালা লেগে গেলো ব্লারির। ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির ধারে দেওয়ালের গায়ে একেবারে লেপ্টে রইলো ও। বিরাট জন্তুটা দাঁড়িয়ে পড়লো ওর সামনে। ভয়ের চোটে কাঁদতে শুরু করলো ব্লারি। দত্যিটা কিছু করলো না, চুপচাপ বসে হ্যা হ্যা করে জিভ্ বের করে বড় বড় চোখ মেলে দেখতে লাগলো ছোট্ট ভালুকটাকে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে ব্লারি শুধোল, 'আমার কাছে কী চাও তুমি'?

'আমি শুধু তোমাকে একটু ভালো করে দেখতে চাই, কেননা তোমার মতন কাউকে আমি আগে কখনো দেখিনি'।

দত্যিটার কথা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ব্লারি। দত্যিটা তো বেশ কথা-টথা বলেতো! হঠাৎ ব্লারির মনে হলো—আচ্ছা, বাড়িতে সেই পুঁচকে দিদিমনিটা আমাকে মোটে বুঝতেই পারতো না

কেন? কিন্তু এই চমৎকার ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার তেমন বেশী সময় পেলো না ও। জন্তুটা তার বিরাট মুখটা হাঁ করলো, দেখা গেলো ভেতরে একসারি ঝকঝকে ধারালো দাঁত। ভয়ে কেঁপে উঠলো ব্লারি। মুরিয়েল যখন ওর গা চাটছিলো, তখনও এতোটা কাঁপেনি ও। দত্যিটা এখন কী করবে রে বাবা, ওর মতলব কী? উত্তর পেতে মোটেই দেরি হলো না। জন্তুটা উঠে দাঁড়িয়ে ওর ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরলো, তারপর অনুমতির তোয়াক্কা না করে ওকে টেনে নিয়ে চললো রাস্তা ধরে।

ব্লারি যন্ত্রণায় কাঁদতেও পারছিলো না, কারণ তাহলে হয়ত জন্তুটা ওর গলার নলিটাই কেটে ফেলবে। চেঁচাতে গেলেও একই ফল হবে। ও শুধু ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলো। কিন্তু কাঁপলে তো আর কোন লাভ হবে না। এখন অবশ্য ওকে আর হাঁটতে হচ্ছে না, ঝুলতে ঝুলতে চলেছে ও। ঘাড়টায় বড্ড ব্যাথা লাগছে, না হলে এভাবে ঝুলে যাওয়াটা কিন্তু দিব্যি লাগতো!

তা, আরও খারাপ কিছুও হতে পারতো। সারাক্ষণ অমন ধাক্কা লাগলে মাথার কি আর ঠিক থাকে? আহ, দত্যিটা আমাকে কোন্ চুলোয় নিয়ে চলেছে? কোথায়?.........জন্তুটার মুখে ঝুলতে ঝুলতে ব্লারির কেমন যেন সব কিছু অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু জ্ঞানহারা ভাবটা বেশিক্ষণ রইলো না, হঠাৎই জন্তুটা ভাবলো—আরে, এ জিনিসটাকে এমনভাবে বয়ে নিয়ে গিয়ে হবেটাই বা কী? এই না ভেবে ব্লারিকে ও মুখ থেকে ধপ করে ফেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেলো। মাটিতে পড়ে রইলো ছোট্ট অসহায় ভালুকটা, যে দুনিয়াটাকে আবিষ্কার করতে চায়। যদিও খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ওর, তাহালেও দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ালো ও। কে জানে, পড়ে থাকলে কেউ হয়তো মাড়িয়ে-টাড়িয়ে চলে যাবে! উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে চোখ কচ্লে চারপাশটা দেখলো ও।

এখানটায় তেমন লোক-জন নেই, পায়ের নিচে তেমন নুড়ি ছড়িয়ে

নেই, কিন্তু রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে সবখানে। এইটাই কি তাহলে জগত? ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা তখন আর বেচারার নেই বললেই চলে। গোটা মাথাটা যেন গুলিয়ে একসা হয়ে গেছে। আর হাঁটতেও ইচ্ছে করছে না। হেঁটে হবেটাই বা কী? মুরিয়েল এখন অনেক দূরে, মা তো আরও দূরে, আর সেই ছোট্ট দিদিমনি…না! জগতটাকে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত থামলে চলবে না—ভাবলো ব্রারি।

ঠিক তখনই পেছনে একটা শব্দ হলো। চমকে উঠলো ও—আবার কোন জন্তু-টন্তু এলো না তো? আরে, এ যে দেখি এক ছোট্ট মেয়ে!

'মা মা, ছাখো, একটা পুঁচকে ভালুক! ওকে আমি নিয়ে যাবো'?

'না খুকু, দেখছো না, ওর শরীর খারাপ! ঐ ছাখো, ওর গা থেকে রক্ত পড়ছে।

'তাতে কী হয়েছে? বাড়িতে গিয়ে ওর রক্ত-টক্তগুলো পরিষ্কার করে দিলেই তো হবে। ওকে নিয়ে গেলে আমার তবু একজন খেলার সঙ্গী হবে'।

ওদের কথাবার্তার একটুও বুঝতে পারছিলো না ব্রারি। ছোট ছোট ভালুকরা তো শুধু পশুদের ভাষাই জানে, মানুষের ভাষা ও আর কেমন করে বুঝবে বলো! কিন্তু সোনালী-চুলওয়ালা মেয়েটাকে দেখতে ভারি মিষ্টি। ব্রারি মুগ্ধ হয়ে পড়লো। তাই ওরা যখন ওর গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে ওকে থলির মধ্যে পুরে নিলো, তখন কোনরকম বাধাই দিলো না ও।

এদিক-ওদিক দোল খেতে খেতে পৃথিবীর পথে এগিয়ে চললো ব্রারি। খানিকদূর গিয়ে মেয়েটা ব্রারিকে থলি থেকে বার করে এনে কোলে করে নিয়ে চললো। আহ্, কী ভাগ্য ব্রারির! এখন ও ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে রাস্তাটাকে। কত উঁচু উঁচু সব পাথরের স্তূপ, আর সেগুলোর মাঝে এখানে-ওখানে এক একটা সাদা-রঙা দরজা মতন। আর সেই উঁচুতে, বুঝি একেবারে আকাশের কাছাকাছি,

একটা ধোঁয়ার ঝুঁটি। এগুলো নির্ঘাৎ সুন্দর দেখানোর জন্যেই করা হয়েছে, অ্যাঁ! যেমন ছোট্ট দিদিমণির টুপিতে থাকে একটা পালক, সেইরকম আর কি। কী মজা, তাই না?

আর নিচে, রাস্তা দিয়ে কী একটা যেন জোরসে ছুটে চলেছে 'টুট-টুট' শব্দ করতে করতে। ছুটছে বটে, কিন্তু তার পা বলে কিছু নেই, শুধু খানকতক বড় মাপের গোল গোল কী সব রয়েছে। যা-ই বলো বাপু, পৃথিবী আবিষ্কার করতে বেরোনোটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার! সারা জীবন বাড়িতে বসে থেকে কোন্ সগ্গোটা লাভ হবে? এই পৃথিবীতে কেন জন্মেছি? সারাক্ষণ মায়ের পাশটিতে বসে থাকার জন্যে নয় নিশ্চয়! আসল কথা হলো সবকিছু নিজের চোখে দেখা, অভিজ্ঞতা লাভ করা। এইভাবেই তো বড় হওয়া যায়। হ্যাঁ, তাই চায় ব্লারি।

শেষমেষ একটা দরজার সামনে দাঁড়ালো মেয়েটা, তারপর ঢুকে পড়লো বাড়ির মধ্যে। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই ব্লারির চোখে পড়লো একটা বেড়াল, অনেকটা ঠিক মুরিয়েলের মত। এগুলোকে তো মিনি-বেড়াল বলে—মনে পড়লো ব্লারির। বেড়ালটা মেয়েটার পা চাটতে গেলো, কিন্তু তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটা ব্লারিকে নিয়ে গিয়ে রাখলো একটা সাদা জিনিসের ওপর। জিনিসটা মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে, বেশ চওড়া, আর একেবারে মসৃণ। তার এক পাশে ধাতুর তৈরি ঝকমকে একটা কিছু রয়েছে, ইচ্ছে করলে সেটাকে এদিক-ওদিক ঘোরানোও যায়। তা, মেয়েটা সেই ধাতুর জিনিসটাকে প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে ব্লারিকে বসিয়ে দিলো একটা শক্ত, ঠাণ্ডামতন জায়গায়। তারপর সে ওর গা-টা ধুইয়ে-মুছিয়ে দিতে লাগলো। সেই হতচ্ছাড়া জন্তুটা যেখানটায় কামড়ে ধরেছিল, সেই জায়গাটাকে খুব ভালো করে ধুইয়ে দিলো ও। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো ব্লারি, কিন্তু কেউ তাতে কান দিলো না।

তবে বড় ভাগ্যের কথা যে মুরিয়েল যতক্ষণ ধরে সাফ-সুতরো

করেছিল, এবার আর ততক্ষণ লাগলো না। কিন্তু এবারের এই ধোয়াধুয়িটায় অনেক বেশি শীত করছিলো ব্লারির। চটপট কাজ সেরে ব্লারির গা-টা মুছিয়ে দিলো মেয়েটা, তারপর ওর গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে, ওকে শুইয়ে দিলো একটা নিচু বিছানায়। সেই ছোট্ট দিদিমণিও ওকে ঠিক এইরকম বিছানাতেই শুতে দিতো। কিন্তু, শুয়ে থাকলে লাভটা কী হবে? ব্লারি এখন একটুও ক্লান্ত নয়, ঘুমোতে ওর একটুও ইচ্ছে করছে না। যেই না মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, অমনি ব্লারি ঝপাং করে বিছানা থেকে নেমে এ-দরজা সে-দরজা, এ-গর্ত সে-গর্ত টপকে-টাপকে আবার এসে হাজির হলো রাস্তার ওপর।

বাইরে এসে বার কয়েক ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস টানলো ও। তারপর নিজের মনেই বললো, 'হুঁ, এখানে কিছু খাবার-দাবার মিলবে মনে হচ্ছে, কেমন ম-ম করা গন্ধ পাচ্ছি যেন!'

গন্ধের টানে টানে চলতে চলতে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ও। এই দরজার ওপার থেকেই ভেসে আসছে মন-মাতানো গন্ধটা। এক মহিলার মোজা-পরা দুখানা পায়ের ফাঁক দিয়ে ফুড়ুৎ করে গলে গিয়ে দোকানটার মধ্যে সেঁধিয়ে পড়লো ব্লারি। উঁচুমতন কী একটা জিনিসের ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো মেয়ে। ব্লারি দোকানে ঢুকতেই মেয়ে দুটো ওকে দেখে ফেললো। মেয়েগুলো বোধহয় দিনভোর খেটে খেটে হয়রান হয়ে পড়েছিল, একটু সাহায্য-টাহায্য পেলে ওদের সুবিধেই হতো। তাই ব্লারিকে দেখা মাত্রই ওরা ওকে টক্ করে তুলে নিয়ে একটা অন্ধকার মতন জায়গায় বসিয়ে দিলো। ওহ্, জায়গাটা কী গরম, কী গরম।

তা, ব্যাপারটা এমন কিছু মন্দ নয়। আসল কথা হলো, এখানে যত খুশি খাবার পাওয়া যায়। মেঝের ওপরে আর নিচু নিচু তাকগুলোতে কত না কেক, পাঁউরুটি, পেস্ট্রি থরে থরে সাজানো! এরকম চমৎকার সব খাবার তো ব্লারি কোনদিন চোখেই দ্যাখে নি।

কিন্তু ব্লারি আর জীবনে কতোটুকুই বা দেখেছে বলো! পেটের মধ্যে এদিকে খিদের কোস্তাকুস্তি চলেছে। ওর আর তর সইলো না। ভালো ভালো খাবারগুলোর ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গবগব করে সেগুলো খেতে শুরু করলো ও। খেলো একেবারে পেট ঠেসে। খাবার চোটে শরীরটা বেশ বেসামাল হয়ে উঠলো ওর।

পেট ঠাণ্ডা করে চারপাশটা আবার ভালো করে দেখলো ব্লারি। সত্যি, এখানে কতো কিছুই না দেখার আছে। এ যেন মিষ্টি খাবারের কোন স্বর্গরাজ্যে এসে পড়েছে ও, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে গাদা গাদা পাঁউরুটি, কেক, জেলি, জ্যাম, বিস্কুট। শুধু তুলে নেওয়ার অপেক্ষা।

আর এখানে সব্বাই কী ব্যস্ত, কী ব্যস্ত! সাদা সাদা পাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে। এই পাগুলো কিন্তু ঠিক রাস্তার সেই পাগুলোর মতো নয়। তবে এত-শত স্বপ্ন দেখার সময় ব্লারির বরাতে জুটলো না। খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল সেই মেয়ে দুটো। ব্লারির হাতে ওরা একটা লম্বা ঝাড়ু ধরিয়ে দিলো, আর শিখিয়ে দিলো কিভাবে ঝাড়ু চালাতে হয়। তা, ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজের সমস্ত অন্ধি-সন্ধিই জানা আছে ব্লারির। মা তো ঘরে ঝাঁট দিতো, ব্লারি কতোদিন দেখেছে। তবে দেখতে সোজা হলে কি হবে, কাজটা মোটেই সোজা নয়। ঘরটা ঝাঁট দেওয়ার জন্যে গলদঘর্ম হয়ে চেষ্টা করলো ব্লারি, কিন্তু ঝাড়ুটা যে বড্ড বড় আর ভারী, ঠিক বাগ মানাতে পারছে না ও। নাকের মধ্যে ধুলো টুলো ঢুকে একসা, হেঁচে হেঁচে সারা হয়ে গেলো ব্লারি।

আর কী বেজায় গরম, বাপস্! একে তো এ-সব কাজ করার অভ্যেস ব্লারির মোটেই নেই, তায় আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো এই গুমসুমি গরম। সব মিলিয়ে ওর বেশ নাজেহাল দশা। কিন্তু একটাই একটু জিরেন নেওয়ার উপায় নেই। কাজ বন্ধ করলেই কেউ না কেউ এসে ফের ওকে কাজে জুতে দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে উপরি পাওনা বাবদ জুটছে এক ঘা করে থাপ্পড়।

ব্রারির তখন মনে হচ্ছিল, 'আহ্, কেন যে মরতে এখানে সেঁধোতে গেলুম। এ-সব বেমক্কা কাজ করা কি আমার পোষায়'। কিন্তু তখন আর কি-ই বা করার ছিলো! ঘর-দোর ঝাঁট ওকে দিতেই হবে, অগত্যা মুখ বুজে তা-ই করে চললো ও। অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁট-পাট দিতে দিতে এক কোণে তো এই বিরাট একটা ধুলো-বালির ডাঁই জমা হয়ে গেলো। তখন একটা মেয়ে এসে ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো। এক জাগায় হলুদ রঙের খানকতক শক্তপোক্ত কাঠের ফালি পড়ে ছিলো। ঐখানেই ওকে শুয়ে পড়তে বললো মেয়েগুলো। ব্রারি বুঝতে পারলো, এবার তাহলে একটু ঘুমোনো যাবে।

হাত-পা মেলিয়ে-খেলিয়ে শুয়ে পড়লো ও। ভাবটা এমন, যেন কাঠের ফালিগুলো খুবই আরামের বিছানা। পরের দিন সকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমোলো ও। সকাল সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠে পড়তে হলো ওকে। যা খেতে চাইলো, খেতে পেলো। তারপর ফের কাজে লাগতে হলো। আহা, বেচারার একটু জিরেন নেবারও ফুরসৎ নেই! এত কাজ করার অভ্যেস তো ওর মোটেই নেই। তার ওপর আবার ঐ গরম। ওহ্, বীভৎস অবস্থা। ওর ছোট্ট মাথাটা আর হাত-পাগুলো যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে। সারা শরীরটা যেন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে একেবারে।

আর তখন, এই প্রথম, বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগলো ব্রারির। মনে পড়লো মায়ের কথা, সেই ছোট্ট দিদিমণির কথা, সেই নরম-নরম বিছানা আর শুয়ে-বসে কাটানো সেই সোনা-রঙা জীবনের কথা। কিন্তু, বাড়িতে কি আর ফিরতে পারবে ও? পালানোর তো কথাই ওঠে না। সারাক্ষণই ওকে নজরে নজরে রাখছে সবাই। তাছাড়া, যে ঘরের মধ্যে রাস্তায় যাওয়ার একমাত্র দরজাটা রয়েছে, সেই ঘরেই ঐ মেয়ে দুটো সারাক্ষণ কাজকম্মো করে। নাহ্, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই ব্রারির। চিন্তা-ভাবনা সব গুলিয়ে গেছে ওর, মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর যেন কম-জোরি

হয়ে পড়েছে। সব কিছুই যেন উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। ধপাস্ করে বসে পড়লো ব্রারি। কেউ ওকে বারণ করলো না। একটু সুস্থ হয়ে ফের কাজে হাত দিলো ও।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুধু ঝাঁট দাও আর ঝাঁট দাও। এক সপ্তাহ চললো এইরকম। ব্রারি যেন আর সব কিছু ভুলে গেছে। ভালুক-ছানারা সব কিছু তাড়াতাড়িই ভুলে যায়, আর সেটাই তো ভালো। কিন্তু ব্রারি যে কিছুতেই নিজের মা আর ঘরের কথাটা ভুলতে পারছে না। শুধু ওর মনের মাঝে মায়ের স্মৃতি আর ঘরের ছবি যেন কেমন অবাস্তব, যেন তারা আজ কতো দূরে!

যে মেয়ে দুটোর হাতে পড়েছিলো ব্রারি, তারা একদিন সন্ধ্যেবেলায় খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলো। তাতে লেখা ছিলো:

বাদামী রঙের একটা ভালুকছানা হারিয়ে গেছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে এনে দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে। ব্রারি বলে ডাকলে ভালুকছানাটা সাড়া দেয়।

বিজ্ঞাপনটা দেখে মেয়ে দুটো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, "আমাদের এই ভালুকছানাটাকেই খুঁজছে নাকি? ও তো খুব একটা খাটতেও পারে না। ঐটুকু জীব আর কতোটাই বা খাটবে! ওকে ফেরৎ দিয়ে কিছু পুরস্কার পেলে মন্দ হয় না, কি বলিস'?

এক ছুট্টে দোকানের পেছনদিকে গিয়ে ওরা চিৎকার করে ডাকলো, 'ব্রারি'!

কাজ করতে করতে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকালো ব্রারি। কেউ যেন ডাকছে মনে হলো! ওর হাত থেকে পড়ে গেলো লম্বা ঝাড়ুটা। ও ভাবলো—আরে, ওরা আমার নাম জানলো কী করে? এদিকে মেয়ে দুটো আরও এগিয়ে এসে আবার ডাকলো, 'হেই ব্রারি'!

ছুট্টে ওদের কাছে এগিয়ে গেলো ব্রারি। তাই না দেখে একটা মেয়ে বলে উঠলো, 'হুঁ, তাহলে ব্রারিই হচ্ছে ওর নাম। চল্, আজ রাত্তিরেই ওকে দিয়ে আসি'গে'।

সেই রাত্তিরেই ব্রারি ফিরে গেলো সেই ছোট্ট দিদিমণির বাড়িতে, আর মেয়ে ছুটোও কিছু পুরস্কার পেয়ে গেলো হাতে হাতে। ছোট্ট দিদিমণি প্রথমে ওর এই অবাধ্যতার জন্তে একটা চড় কষালো, তারপর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেলো—যাক্‌গে বাবা, ভালোয় ভালোয় ফিরে তো এসেছে ভালুকছানাটা। ব্রারির মা শুধালো।

'কেন পালিয়েছিলি রে' ?

'আমি জগৎটাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলুম',—উত্তর দিলো ব্রারি।

'পেলি' ?

'ওহ্, এই ক'দিনে আমি অনেক, অ-নে-ক কিছু দেখেছি। এখন আমি খুব অভিজ্ঞ ভালুক হয়ে উঠেছি, বুঝলে তো' !

'হুঁ তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমি জানতে চাইছি—জগৎটাকে কি তুই আবিষ্কার করতে পারলি' ?

'না, মানে……মানে আসলে……আসলে আমি তো জগৎটাকে খুঁজেই পাইনি' !

এক পরীর গল্প

১২ মে, ১৯৪৪

যে পরীটার কথা বলছি, সে কিন্তু পরীর দেশের কোন সাধারণ পরী নয়, তোমরা যাদের সাধারণত দেখতে পাও। এ এক বিশেষ পরী, আলাদারকম পরী। তাকে দেখতে আলাদা, তার কাজকর্মের ধরণ-ধারণও আলাদা। তা, এই সব শুনে-টুনে কেউ হয়তো বলতে পারে —কেন সে আলাদা?

তবে বলি শোনো। এই পরীটা শুধু কাউকে একটু সাহায্য করা, কোথাও একট আমোদ করা—এইসব নিয়ে থাকতো না। সে চেষ্টা করতো সারা পৃথিবী জুড়ে, সব মানুষের জীবনে আনন্দ নিয়ে আনতে।

পরীটার নাম ছিলো এলেন। ও যখন খুব ছোট, তখনই ওর মা-বাবা মারা যান। তাঁরা অবশ্য ওর জন্য অনেক টাকা-পয়সা রেখে গেছলেন। এলেন তাই ছোট হলেও নিজের ইচ্ছেমতো যে কোন কাজ করতে পারতো, যা খুশি কিনতেও পারতো। অন্য কোন পরী কিম্বা ছোট মেয়ে-টেয়ে হলে তো এই সুযোগ পেয়ে একেবারেই বখে যেতো, কিন্তু এলেন সে ধাতুতে গড়া নয়। বড় হয়ে ও শুধু সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় আর চমৎকার চমৎকার খাবার দাবারই কিনতো ঐ টাকা দিয়ে।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙলো এলেনের। নরম বিছানায় শুয়ে ও ভাবলো, 'আচ্ছা, টাকাগুলো নিয়ে কী করা যায়? অত টাকা তো আমি খরচ করতে পারবো না, আর ওগুলো আমার সঙ্গে কবরেও

যাবে না। এই টাকা দিয়ে অন্তদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলে কেমন হয় ?'

ব্যস, তখন থেকেই কাজে লেগে পড়লো এলেন। বিছানা থেকে উঠে জামা কাপড় পরে নিলো ও। তারপর একটা বেতের ঝুড়িতে এক বাণ্ডিল টাকা নিয়ে, বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

রাস্তায় বেরিয়ে ওর মনে হলো, 'কোত্থেকে শুরু করা যায় ? আচ্ছা, প্রথমে কাঠুরিয়ার বিধবা বৌয়ের কাছেই যাওয়া যাক। আমি গেলে উনি নিশ্চয় খুব খুশি হবেন। ওনার স্বামী তো কিছুদিন হলো মারা গেছেন, খুব কষ্টে আছেন মহিলা।'

গান গাইতে গাইতে ঘাসের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললো এলেন। কাঠুরিয়ার ঘরের সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লো ও। ভেতর থেকে কে যেন বললো, 'ভেতরে এসো'। আস্তে করে দরজাটা খুলে ভেতর দিকে তাকালো এলেন। একটা আঁধার ভরা ঘর। ঘরটার এককোণে জরাজীর্ণ একখানা আরামকেদারায় বসে সেলাই করছেন একজন বৃদ্ধা।

ঘরে ঢুকেই টেবিলের ওপর একমুঠো টাকা রাখলো এলেন। তা দেখে বৃদ্ধা খুব অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু আর পাঁচজনের মতন তাঁরও জানা ছিলো যে পরীরা আর বামনরা কিছু দিলে তা নিতে হয়।

তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি তো বড় ভালো মেয়ে খুকি। এরকম নিঃস্বার্থভাবে তো কেউ কাউকে কিছু দান করে না। শুধু তোমাদের মতন পরীর দেশের লোকজনরাই এরকমভাবে দান করতে পারে'।

অবাক-অবাক চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে এলেন শুধোল, 'তার মানে' ?

'মানে, বিনিময়ে কোন কিছুর প্রত্যাশা না করেই দান করে, এমন লোক এ জগতে খুব বেশি নেই'।

'তাই বুঝি ? কিন্তু আপনার কাছ থেকে কোন কিছু আমি চাইবোই বা কেন ? বরং ঝুড়িটা একটু হাল্কা হয়ে গেলো বলে আমার তো বেশ আনন্দই হচ্ছে'।

বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি খুব ভালো বাছা। অনেক ধন্যবাদ'।

বৃদ্ধাকে বিদায় জানিয়ে, বেরিয়ে এলো এলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই ও পৌঁছে গেলো পরের বাড়িটাতে। এই বাড়িটার লোক-জনকে চেনে না এলেন, তবু দরজার কড়া ধরে নাড়া দিলো ও। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই ও বুঝতে পারলো যে এ-বাড়ির লোকদের টাকা-পয়সার কোন দরকার নেই। এদের কোন জিনিসপত্রেরই অভাব নেই। অভাব শুধু আনন্দের। এদের কোন আনন্দ নেই। বাড়ির ভদ্রমহিলাটি ওকে স্বাগত জানালেন, কিন্তু তাঁর শরীরের মধ্যে কোথাও যেন আনন্দের ছাপ নেই। চোখদুটো নিস্তেজ, সারা মুখে যেন দুঃখের ছবি আঁকা। বাড়িতে একটু বেশি সময় থাকার ইচ্ছে হলো এলেনের।

মনে মনে ভাবলো ও, 'দেখা যাক, হয়তো আমাকে দিয়ে এঁর কোন উপকার হলেও হতে পারে'। আর সত্যিই, ও একটা আসনে বসার পর ভদ্রমহিলা নিজে থেকেই তাঁর সমস্যার কথা বলতে শুরু করলেন।

নিজের নষ্টবুদ্ধি স্বামীর কথা, দুষ্টু ছেলেমেয়েদের কথা আর অন্য নানান দুর্ভাগ্যের কথা এলেনকে শোনালেন ভদ্রমহিলা। চুপচাপ সবটা শুনে গেলো এলেন, মাঝে-মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন-ট্রশ্ন করে ভদ্রমহিলার সব দুঃখের কথাই ও জেনে নিলো।

ভদ্রমহিলার কথা শেষ হওয়ার পর, এলেন শুধোল,

'দেখুন, আমার নিজের জীবনে কখনো এ-সব ঘটেনি। আপনার জন্যে এখন কী করা যায়, তা-ও আমার জানা নেই। তবু, আমি আপনাকে গোটাকতক কথা বলতে চাই। আমার নিজের যখন খুব একা-একা লাগে, খুব দুঃখু হয়, তখন আমি এইসব কথাগুলোই মেনে চলি।

'কোন এক সুন্দর ভোরে বেরিয়ে পড়ুন বাড়ি থেকে। হাঁটতে থাকুন বিরাট অরণ্যের মাঝ দিয়ে। একেবারে সেই মাঠের কাছে গিয়ে থামুন। তারপর লতা-ঝোপগুলোর মধ্যে খানিক ঘুরে-ফিরে

কোথাও বসে পড়ুন। বসে থাকুন চুপটি করে, কিছু করবেন না তখন। চোখ মেলে দেখুন শুধু ঐ নীল আকাশকে, ছড়িয়ে-থাক গাছগুলোকে। দেখবেন, আস্তে আস্তে আপনার মনের মধ্যে একটা শান্তির আভা ছড়িয়ে পড়বে। আর তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনকিছুই একেবারে পুরোপুরি খারাপ হতে পারে না, মানুষ চেষ্টা করলে খারাপকে ভালো করতেও পারে'।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না বাছা, ওতে কোন কাজ হবে না। কত ওষুধ-পত্তোরই তো খেলুম আমি, কিছুতেই কিছু হলো না। তোমার উপদেশেও কোন কাজ হবে না, এ আমি ঠিক জানি'।

পরী বললো, 'তবু একবার চেষ্টা করেই দেখুন না। মানুষ যখন প্রকৃতির মাঝে একলাটি হয়, তখন তার আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। প্রথমটায় আপনার মনের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবে, তারপর আপনি উছলে উঠবেন আনন্দে। বুঝবেন, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন'।

'তা, বলছো যখন, একদিন না হয় চেষ্টা করেই দেখবো'—ভদ্রমহিলা বললেন।

'বাহ্, খুব ভালো কথা। পারলে সামনের সপ্তাহে এই সময় একবার দেখা করে যাবো।'

এইভাবে একের পর এক বাড়িতে ঘুরে বেড়ালো এলেন। লোকজনকে ও সাহস দিলো, সান্ত্বনা দিলো। দিনের শেষে ওর ঝুড়ির সব টাকা ফুরিয়ে গেলো, আর আনন্দে ভরে উঠলো ওর বুক। পোশাক-আশাক কেনার থেকে অনেক ভালো কাজেই ব্যয় হয়েছে টাকাগুলো। তারপর থেকে প্রায়ই এলেন ঐভাবে টহল দিতে বেরোতো। হলুদ রঙের ফুল-আঁকা ফ্রকটা পরে ইতি-উতি ঘুরতো ও, চুলটা বেঁধে নিতো বড় একটা ফিতে দিয়ে, আর হাতে থাকতো বেতের ঝুড়িটা। ঠিক এই চেহারাতেই ওকে দেখা যেতো সর্বত্র।

যে মহিলার অনেক টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও সুখ বলে কিছু ছিলো

না, তিনিও আস্তে আস্তে আনন্দের স্বাদ পেতে লাগলেন। এলেন তা জানতো। ওর তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না।

দেখতে দেখতে এলেনের অনেক বন্ধু জুটে গেলো। না, এইসব বন্ধুরা কিন্তু পরী কিম্বা বামন নয়। অনেক মানুষ আর তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাই ওর বন্ধু হয়ে উঠলো। বাচ্চারা ওর কাছে মনের কথা সব খুলে বলতো। আর তার ফলে এলেনের অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে উঠলো। যে কোন ব্যাপারেই ও সবাইকে ঠিক-ঠিক রাস্তা দেখাতে পারতো।

কিন্তু নিজের টাকা-পয়সার ব্যাপারে ওর হিসেবে গণ্ডগোল ছিলো। বছর খানেক পরে দেখা গেলো—নিজে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মতন টাকাই শুধু পড়ে আছে ওর তহবিলে।

কেউ যদি ভেবে বসে যে এরপর এলেন খুব দুঃখিত হয়ে পড়লো, কাউকে কিছু দেওয়া-টেওয়া বন্ধ করে দিলো—তাহলে সে মারাত্মক ভুল করবে। এলেন একইভাবে দিয়ে চললো সবাইকে। না, টাকা-পয়সা নয়। সবাইকে ও শোনাতো সৎ পরামর্শ, ভালোবাসা, সান্ত্বনা। ও শিখে নিয়েছিলো যে, একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেও, চেষ্টা করলে জীবনকে সুন্দর করে তোলা যায়। হাজার গরীব হলেও, প্রত্যেকেই পারে অন্যদেরকে সাহায্য করতে।

অনেক অ-নে-কদিন বেঁচে ছিলো এলেন। যখন ও মারা গেলো, তখন সারা দেশ ভেঙে পড়লো কান্নায়। দেশজোড়া এমন শোক আগে কখনও দেখা যায় নি। কিন্তু এলেন মারা গেলেও, তার আত্মা রয়ে গেলো। মানুষরা যখন ঘুমোত, তখন ওর আত্মা তাদের ঘুমের প্রহরকে ভরে দিতো সুন্দর সুখের স্বপ্নে। এমনকি তাদের তন্দ্রার মধ্যেও ভেসে উঠতো এই পরীটির মুখ, সে তাদেরকে দিয়ে যেতো সৎপথে চলার পরামর্শ।

রিতা

তখন ঠিক সোয়া চারটে বাজে। সুনসান একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলুম আমি। যেতে যেতে ভাবলুম—কাছের ঐ মিষ্টির দোকানটায় ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। ঠিক তখনই পাশের একটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এলো দুটো অল্পবয়সী মেয়ে। হাতে হাতে ধরে খলবল খলবল করে বকর বকর করতে করতে ওরাও চলেছে ঐ মিষ্টির দোকানটার দিকেই।

অল্পবয়সী মেয়েদের কথাবার্তা শুনতে মাঝে-মাঝে দারুণ লাগে। যে কোন মামুলী ব্যাপারেই খিলখিল করে হেসে ওঠে মেয়েগুলো। ওদের এই হাসিটা বড় ছোঁয়াচে। ওদের হাসির ছোঁয়ায় আশপাশের লোকেরাও আপনা থেকেই হেসে ওঠে।

চুপি চুপি চললুম ওদের পিছু পিছু, আড়ি পেতে শুনতে লাগলুম ওদের কথাবার্তা। হাত-খরচের টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলছিলো। খুব গুরুগম্ভীর ভাবে আলোচনা করছিলো,—এই টাকা দিয়ে কী কেনা যায়? বাজি রেখে বলতে পারি, এইসব কথা বলতে গিয়ে ওদের জিভে জল এসে পড়ছিলো। মিষ্টির দোকানে ঢুকেও ওরা সমানে বক্‌বক করে চললো, আর চকচকে চোখে তাকাতে লাগলো কাঁচের আলমারির মধ্যে রাখা খাবারগুলোর দিকে।

আমিও তো ঐসব রসালো খাবারগুলোকে চোখ দিয়ে গিলছিলুম। বুঝতেই পারছিলুম, কোন্ খাবারটা নেবে ওরা। দোকানের ভেতরে তখন কোন খদ্দের-টদ্দের ছিলো না। কাজেই চাওয়া মাত্রই মেয়েদুটো খাবার পেয়ে গেলো। দুজনে নিলো দুটো চমৎকার ফলের চাটনি। আর, কী আশ্চয্যি বাপু, চাটনি দুটো এতটুকু চেখেও দেখলো না ওরা, নিয়ে চললো সঙ্গে করে।

মিনিটখানেক পরে আমারও কাজ মিটে গেল। রাস্তায় নামলুম। সামনেই চলেছে মেয়ে দুটো, বক্‌বকম করছে জোর গলায়। সামনের মোড়টাতে আরেকটা মিষ্টির দোকান। দোকানটার সামনে দেখি একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। করুণ চোখে মেয়েটা তাকিয়ে আছে কাঁচের আলমারিতে রাখা খাবারগুলোর দিকে। আগের মেয়ে দুটো এই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলো। আমি যখন মোড়-টাতে পৌঁছলুম, তখন আগের দুজন মেয়ের মধ্যে একজনকে বলতে শুনলুম, 'খুকি, তোমায় খিদে পেয়েছে? ফলের চাটনি খাবে'?

বাচ্চাটা তো একপায়ে খাড়া। ঘাড় নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ-অ্যাঁ'!

অন্য মেয়েটা দাবড়ে উঠলো, 'কি সব হাঁদার মতো বকছিস রিটা। চাটনি চটপট খেয়ে নে। এইত্থাখ না, আমার চাটনি আমি সাফ করে ফেলেছি চেটে-পুটে। বাচ্চাটাকে ওটা দিয়ে দিলে, তোর নিজের বলতে থাকবেটা কী শুনি'?

রিটা কোন উত্তর দিলো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একবার বাচ্চাটার মুখের দিকে, আর একবার চাটনিটার দিকে দেখতে লাগলো ও। তারপর হঠাৎ বাচ্চাটার হাতে চাটনিটা তুলে দিয়ে বললো,—

'নে, এটা তুই খেয়ে নে। আমি তো এক্ষুনি বাড়িতে গিয়ে খেতে বসবো'।

বাচ্চা মেয়েটা কিছু বলার আগেই হনহনিয়ে ওখান থেকে চলে গেলো রিটা আর ওর বন্ধু। আমি এগিয়ে গেলুম বাচ্চাটার দিকে। ও ততক্ষণ চাটনিটায় পেল্লায় একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে। চোখে-মুখে পরম আরামের ছাপ। আমাকে দেখে ও বললে:

'একটু খেয়ে দেখুন না, দিদি। আমাকে একজন দিয়েছে'।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এগিয়ে চললুম হাসিমুখে। আচ্ছা, ফলের চাটনিটা থেকে সবথেকে বেশী আনন্দ কে পেয়েছিল বলো তো? রিটা, ওর সেইই বন্ধু, নাকি বাচ্চা মেয়েটা!

আমার তো মনে হয় সবথেকে বেশি আনন্দ রিটাই পেয়েছিলো।